এবং তাহাদের পিতা নিজে টাকার যিম্মা হইয়া খোলা করায়, তবে তালাক হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু মহর মাফ হইবে না।

মাফ্‌কুদের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী একেবারে নিখোঁজ ও লা-পাতা হইয়া যায়, জীবিত আছে, না মরিয়া গিয়াছে তাহার কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া না যায়, তবে সে অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে না, হয়ত স্বামী আসিতে পারে এই আশায় তাহার স্বামীর ৯০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছবর করিতে হইবে। তখন হুকুম দেওয়া হইবে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। তারপর যদি অন্যত্র বিবাহ বসিবার স্ত্রীর বয়স এবং ইচ্ছা থাকে, তবে স্বামীর ৯০ বৎসর বয়সের পর হইতে (চার মাস দশ দিন) ইদ্দত অতীত হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে। কিন্তু শর্ত এই যে, কোন মুসলমান হাকিমের দ্বারা ঐ স্বামীর মৃত্যুর হুকুম লাগাইতে হইবে। (মুসলমান হাকিমের হুকুম ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ জায়েয হইবে না।)

[এই যে হুকুম বর্ণনা করা হইল ইহাই আমাদের হানাফী মাযহাবের হুকুম। কিন্তু এই হুকুমে আজকাল অনেক স্ত্রীলোকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমন কি কোন কোন হতভাগিনী ছবর করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা বা ঈমান বরবাদ করিয়া বসে। এই অবস্থা দর্শনে মোজাদ্দেদে হক্কানী আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব পাক-ভারতের সমস্ত আলেমের মত সংগ্রহ করিয়া মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং মেছের ও মগরেব হইতে ইমাম মালেক ছাহেবের মাযহাব অনুযায়ী ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়া 'আল্‌হীলাতোন্নাজেযাহ,' নামক একখানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। সেই কিতাবে এইরূপ হতভাগিনীদের যেমন, (১) যাহার স্বামী লা-পাতা হইয়া গিয়াছে, (২) যাহার স্বামী নপুংসক অথচ স্ব-ইচ্ছায় তালাক দেয় না, (৩) যাহার স্বামী স্ত্রীকে ছাড়েও না আনেও না, (৪) যে পিতৃহীনাকে তাহার চাচা বা ভাই নাবালেগা অবস্থায় বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু মেয়ে বালেগা হইয়া স্বামীকে কবূল করে না, তবুও স্বামী তাহাকে ছাড়ে না, (৫) যাহার স্বামী নিখোঁজ নয় বটে কিন্তু চির পরবাসে বা চির কারাবাসে থাকে, স্ত্রীর কোন খবরগীরি করে না বা করিতে পারে না। তাহার জান ও ঈমান বাঁচাইবার ব্যবস্থা কি এবং তাহার জন্য কি কি শর্ত পালন করিতে হইবে, তাহা সব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় দেখিয়া লওয়া দরকার। এখানে আমি সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি—এইরূপ হতভাগিনীদের জান ছুটাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি এই যে, বিবাহের সময় কাবিননামায় স্বামীর নিকট হইতে শর্ত লাগাইয়া মেয়ের জন্য বা মেয়ের বাপ-ভাই মুরব্বীদের জন্য তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্থাৎ "তফ্‌বীযে তালাক" লইয়া রাখিবে।

তফ্‌বীযে তালাকের কাবিন লিখিতে অনেকে এমন ভুল করিয়া বসে যে, আসল মক্‌ছুদ হাছেল হয় না। এই জন্য আমরা এখানে একটি কাবিননামার নমুনা লিখিয়া দিতেছি।]

—অনুবাদক

তফ্‌বীযে তালাকের শর্ত যুক্ত কাবিননামা

কস্য কাবিননামা পত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে—

আমি অমুক, পিং অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, থানা অমুক, জিং অমুক। আমার বিবাহ মোসাম্মাৎ অমুক, পিং অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, জিং অমুক এর সহিত নিম্নলিখিত শর্তসমূহের উপর এত টাকা দেন-মহরের পরিবর্তে ধার্য হইয়াছে। নগদ এত, বাকী এত।

অতএব, আমি স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে স্বইচ্ছায়, অত্র কাবিননামা ও অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে আমি শর্তসমূহ স্মরণ রাখি এবং পালন করি এবং খোদা-নাখাস্তা যদি আমি শর্তসমূহ পালন না করি, তবে যেন বিবি মজকুরা সহজেই নিজ জান ছুটাইয়া লইতে পারে। অতএব, আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতদিন বিবি মজকুরা আমার বিবাহে থাকিবে ততদিন নিম্নলিখিত সমস্ত শর্ত আমি রীতিমত পালন করিব। উভয় পক্ষের এতমিনান করিবার নিমিত্ত লিখিয়া দিতেছি যে, যদি আমি বিবি মজকুরাকে বিবাহ করি, (১) এবং বিবাহের পর নিম্নলিখিত শর্তসমূহ হইতে একটি শর্তও বিবি মজকুরা (অথবা তাহার অমুক গার্জিয়ান) খেলাফ পায়, তবে বিবি মজকুরাকে (অথবা তাহার অমুক মুরব্বিকে) আমি ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি যে, শর্ত খেলাফ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ অথবা তারপর অত্র বিবাহের মধ্যে যে কোন সময় সে (বা তাহার অমুক মুরব্বি) এক তালাক বায়েন, (২) তাহার নফ্‌সকে দিয়া আমার বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করুক।

শর্তসমূহ এই—

অত্র কাবিননামা আমি দেখিয়া বা পড়াইয়া শুনিয়া দস্তখত বা আঙ্গুলের টিপ দিতেছি,

তাং মাস সন বাং ইং হিং

খাকছার সাক্ষী সাক্ষী

সাধারণতঃ আমাদের দেশে ঈজাব-কবূলের পূর্বেই কাবিননামা লেখা হয়, কাজেই কাবিননামায় যদি "আমি বিবি মজকুরাকে বিবাহ করি", কথাটি উল্লেখ থাকা দরকার; নতুবা শর্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাবিননামায় সাধারণতঃ তিন তালাক বায়েন যেন না হয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ; কারণ শরীঅত অনুযায়ীও গোনাহ্‌গার হইতে হয়, তাছাড়া দুনিয়াতেও পরে অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই জন্য আমরা নমুনায় এক তালাক বায়েন লিখিয়াছি। সাধারণতঃ কাবিনে শুধু "আমি" শব্দ লেখা হয়, কিন্তু তাহাতে শুধু সেই মজলিসে থাকাকালে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকে পরে থাকে না অথবা একেবারে ব্যাপকভাবে 'যে কোন সময়' লেখা হয় তাহাতে অত্র বিবাহের পরেও তিন তালাক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা থাকে; কাজেই আমরা "যদি"ও লিখিয়াছি "যে কোন সময়"ও লিখিয়াছি অতঃপর "অত্র বিবাহের মধ্যে"ও লিখিয়াছি।

দ্বিতীয় উপায় এই যে, মুসলমান হাকিমের নিকট বিচারপ্রার্থী হইতে হইবে। কারণ বিবাহ বন্ধন এতই শক্ত বন্ধন যে, তাহা ছিন্ন করার মাত্র তিনটিই উপায়; এতদ্ব্যতীত চতুর্থ উপায় নাই! যথা—(১) মৃত্যু, (২) সাবালেগ স্বামীর তালাক, (৩) মুসলমান হাকিমের হুকুম। হাকিমের জন্য

আবার মুসলমান হওয়ার শর্ত এবং মুসলমান হাকিমের জন্য আবার শরীঅতের মোয়াফেক মকদ্দমার শুনানি এবং হুকুম জারী শর্ত। নতুবা যদি কোন অমুসলমান হাকিম মকদ্দমার শুনানি লইয়া ফয়সালা লিখিয়া যায়, পরে কোন মুসলমান হাকিম হুকুম জারী করে অথবা মুলমান হাকিমও শরীঅতের নিয়ম পালন না করিয়া বিচার করে, তবে বিবাহ ফছ্খ্ হইবে না।

কিন্তু বিধর্মী রাজত্বের দেশে শর্ত অনুযায়ী মুসলমান হাকিম পাওয়া বড় দুষ্কর। কেননা, গভর্ণমেণ্টের আইনে আমাদের এই বিপদ দূর করিবার জন্য খাছ কোন মুসলমান হাকিম নাই; অথচ আমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে মুসলমান হাকিম ব্যতিরেকে আমাদের এই বিপদ উদ্ধার হইতে পারেনা। বিশেষতঃ মকদ্দমার শুনানি এবং হুকুম জারী উভয় মুসলমান হাকিমের হাতে হওয়ার শর্ত থাকায়। কারণ, হয়ত হাকিম বদল হইয়া গেলে অমুসলমান হাকিমের হাতে মকদ্দমা পড়িলে সব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই হয়ত কোন মুসলমান স্বাধীন বা করদ মিত্র রাজ্যে গিয়া হুকুম আনিতে হইবে, না হয় "আদেল জমা'আতে মুসলেমীন"-এর উপর বিচার-ভার ন্যস্ত করিতে হইবে।

আদেল জমা'আতে মুসলেমীনের জন্যও ৪টি শর্ত আছেঃ প্রথম শর্ত—কম পক্ষে তিন জন লোকের জমা'আত হইতে হইবে। দ্বিতীয় শর্ত—জমা'আতের প্রত্যেক মেম্বারকেই আদেল হইতে হইবে অর্থাৎ এরূপ হওয়াই চাই যে, কেহই গোনাহে কবীরা ত আদৌ করেই নাই, ছগীরা গোনাহ্ও পর পর বিনা তওবায় তিনবার করে নাই। যদি কোন সময় ভুল-ত্রুটিবশতঃ গোনাহ হইয়া যায়, তবে অবিলম্বে তওবা করিয়া লয়। অতএব, সুদখোর, ঘুসখোর, মিথ্যাবাদী, বে-নামাযী, অত্যাচারী, শরাবী, জুয়ারী, দাড়ীমুণ্ডনকারী, পর্দা ছেদনকারী প্রভৃতি লোক জমা'আতের মধ্যে মোটেই থাকা উচিত নহে; নতুবা ছহীহ্ হইবে না; তৃতীয় শর্ত—বিচার পদ্ধতি শতীঅতের নিয়ম অনুসারে হওয়া চাই; কাজেই জমা'আতের সব মেম্বার জ্ঞানী আলেম হওয়া চাই, অন্তত এক জন জ্ঞানী আলেম ত হওয়া চাই-ই। জ্ঞানীর অর্থ হইল—তিনি যেমন শরীঅতের মাসআলা মাসায়েল ওয়াকেফ থাকিবেন, বৈষয়িক বিচার-পদ্ধতির জ্ঞানেও তেমন পরিপক্ক থাকিবেন। চতুর্থ শর্ত—জমা'আতের সদস্যদের মধ্যে বিচারে কাহারও আদৌ মতভেদ না থাকা চাই, হুকুমের বেলায় সকলকে একমত হইতে হইবে, যদি একজনেরও সামান্য মতভেদ থাকে, তবে হুকুম ছহীহ্ হইবে না। পঞ্চম শর্ত—বিচার পদ্ধতি, তাহ্কীক্বাত, সাক্ষী, জবানবন্দী, হুকুম জারী সবই শরীঅতের বিধান মতে হওয়া চাই। এই পাঁচ শর্তের একটি শর্তেরও বিন্দুমাত্র খেলাফ হইলে বিবাহ বন্ধন ছেদন হইবে না, অন্যত্র বিবাহও দুরুস্ত হইবে না। নপুংসকের জন্য কি শর্ত, পাগলের জন্য কি শর্ত, মাফ্কুদের মৃত্যুর হুকুমের জন্য চার বৎসর কোন্ তারিখ হইতে ধরিতে হইবে, ইদ্দত কোন তারিখ হইতে হিসাব হইবে, উপস্থিত অত্যাচারী স্বামী বা অনুপস্থিত অত্যাচারী স্বামীর সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং খেয়ারেবলুগের জন্য কি কি শর্ত, মকদ্দমা দায়ের করার জন্য কত দিন সময়—তাহা সব উক্ত কিতাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বড় আলেম ব্যতীত এই সব মাসআলা মীমাংসার ক্ষমতা সাধারণ আলেমের নাই। বড় আলেমেরও উক্ত কিতাব দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া হুকুম জারী করা চাই। —অনুবাদক

ইদ্দতের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** স্বামীর মৃত্যু বা তালাক ইত্যাদি কারণে স্ত্রীর যে কিছু মুদ্দতের (কালের) জন্য এক বাড়ীতে থাকিতে হয়, অন্যত্র যাইতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসিতে পারে না, ইহাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দত পুরা হওয়ার পূর্বে অন্যত্র যাওয়া ও বিবাহ বসা হারাম। ইদ্দত পুরা হইলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।

২। **মাসআলা ঃ** স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে, রজ্‌য়ী তালাক হউক অথবা বায়েন তালাক হউক, এক তালাক হউক অথবা তিন তালাক হউক, স্ত্রীর পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতেই নির্জন বাসস্থানে থাকিতে হইবে, (রাত্র বা দিনে তথা হইতে অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না এবং অন্য কোথাও বিবাহও বসিতে পারিবে না। [তালাকের তারিখের] পর যতদিন পর্যন্ত তিনটি হায়েয পূর্ণরূপে অতীত না হইবে, তত-দিন পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ বসা হারাম ;) অবশ্য যখন পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত হইয়া যাইবে তখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে (এবং ইচ্ছামত বিবাহ বসিতে পারিবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এমন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় যে, তাহার বয়স কম হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে হায়েয আসে না, তবে তাহার তিন হায়েযের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। তালাকের তারিখ হইতে তিন মাস পর্যন্ত অন্য কোথাও যাইতে বা বিবাহ বসিতে পারিবে না। পূর্ণ তিন মাস অতীত হওয়ার পর অন্যত্র যাইতেও পারিবে এবং বিবাহও বসিতে পারিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** অল্প বয়স্কা স্ত্রীর তালাক হওয়াতে হায়েয না আসার কারণে মাসের হিসাবে ইদ্দত পালন শুরু করিয়াছিল এক মাস বা দুই মাস অতীত হওয়ার পর হায়েয আসিল, এইরূপ অবস্থায় হায়েযের হিসাবই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি হায়েয শুরু হয়, তবে আর সামনে হিসাব ধরা যাইবে না, পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** গর্ভাবস্থায় তালাক হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। যখন সন্তান প্রসব হইবে, তখনই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। যদি তালাকের কয়েকদিন পরেও সন্তান প্রসব হয়, তবুও সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। (তিন মাস বা তিন হায়েয পুরা করিতে হইবে না।)

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ হায়েযের হালতে তালাক দেয়, তবে ঐ হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাইবে না, উহার পর পূর্ণ তিনটি হায়েয ইদ্দত পালন করিতে হইবে। হায়েযের হালাতে তালাক দেওয়া হারাম।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস বা নির্জনবাস হইয়াছে, নির্জনবাসের কারণে পূর্ণ মহর ওয়াজেব হউক কিংবা না হউক, এধরনের স্ত্রীর উপর তালাকের পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব। আর যদি কোন প্রকারের নির্জনবাস না হইয়া থাকে, তবে এমন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালন ওয়াজেব নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ পর স্ত্রীকে নিজ স্ত্রী মনে করিয়া ধোঁকায় পড়িয়া সহবাস করিল। অতঃপর জানা গেল যে, উক্ত রমণী তাহার স্ত্রী ছিল না, তখন ঐ রমণীরও ইদ্দত কাটাইতে হইবে। যতদিন ইদ্দত শেষ না হইবে ততদিন নিজ স্বামীকেও সহবাস করিতে দিবে না। যদি সহবাস করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পাপী হইবে। উপরোল্লিখিত ইদ্দতই এরূপ সহবাসের ইদ্দত। যদি ঐ দিন গর্ভবতী হইয়া থাকে, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ছবর করিবে এবং ইদ্দত কাটাইবে। এই সন্তান হারামী হইবে না, ইহার বংশ ঠিক আছে, যে ব্যক্তি ধোঁকায় পড়িয়া সহবাস করিয়াছে তাহারই সন্তান ধর্তব্য হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** শরীঅতের খেলাফ বিবাহ হইয়া যদি সহবাস হইয়া যায়, যেমন যদি স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হইবার পূর্বে বিবাহ করে অথবা স্বামী জীবিত থাকিতে তালাক দেওয়ার পূর্বে বিবাহ করে (অথবা বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করে) অথবা দুধ-ভগ্নী ইত্যাদিকে বিবাহ করে, তবে যখন হইতে ঐ ব্যক্তি তওবা করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে পরিত্যাগ করিবে, তখন হইতে ইদ্দত গণনা শুরু করিতে হইবে। অবশ্য এইরূপ বে-কায়দা বিবাহে যদি সহবাস না হয়, তবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে না (বা ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকিলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি সেই ব্যক্তির সহিতই বিবাহ সাব্যস্ত হয়, তবেও পুনরায় ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।)

১০। **মাসআলা ঃ** ইদ্দত কালের ভরণ-পোষণ এবং অন্য সবই তালাকদাতার যিম্মায়। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পরে আসিতেছে।

১১, ১২। **মাসআলা ঃ** তালাকে বায়েন দেওয়ার পর পূর্ব স্বামী হইতে সতর্কতার সহিত পূর্ণ মাত্রায় পর্দা করা স্ত্রীর কর্তব্য। তা সত্ত্বেও যদি ভুলক্রমে ইদ্দতের মধ্যে সহবাস হইয়া পড়ে, তবে ঐ সহবাসের পর হইতে পুনরায় ইদ্দত গণনা করিবে। অর্থাৎ ঐ সহবাসের পর হইতে পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত হইলে পর ইদ্দত খতম হইবে।

মওতের ইদ্দত

১। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে তাহার চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ফরয। স্বামীর মৃত্যুর কালে স্ত্রী যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতেই থাকিবে, তাহা হইতে বাহিরে যাওয়া দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি স্ত্রীলোক খুব গরীব হয় এবং বাহিরে কাজকর্ম ব্যতিরেকে খাওয়া-পরার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাহিরে যাইতে পারিবে বটে, কিন্তু রাত্রির বেলায় সেই বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। বৃদ্ধা হউক বা যুবতী হউক, না-বালেগা হউক বা বালেগা হউক সকলের জন্যই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের হুকুম। অবশ্য যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তবে চার মাস দশ দিন হিসাব ধরা হইবে না, ধরা হইবে সন্তান প্রসব; এমনকি স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পরে যদি সন্তান প্রসব হয়, তবে সন্তান হওয়া মাত্র ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** বাড়ীর মধ্যে যদি কয়েকটি ঘর বা ঘরের মধ্যে কয়েকটি কামরা থাকে, তবে যে-কোন ঘরে বা যে-কোন কামরায় থাকিতে পারিবে (এবং উঠানের মধ্যেও বাহির হইতে পারিবে। অবশ্য যদি বাড়ীর অন্য ঘরগুলি বা ঘরের মধ্যের অন্য কামরাগুলি অন্যের হয়, তবে তথায় যাইবে না।) কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা শোকের জন্য একটি খাছ জায়গা ঠিক করিয়া লয়, সেই জায়গা ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় না। ইহার কোন দলীল নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ স্বামীর মৃত্যুকালে যদি স্ত্রী গর্ভবতী থাকে, তবে গর্ভ খালাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান হারামী হইবে স্বামীর হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু চাঁদের ১ম তারিখ হইবে, সে (যদি গর্ভবতী না হয়, তবে) চাঁদের হিসাবে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করিবে। (চাঁদ ২৯ দিনের হউক বা ৩০ দিনের হউক, চারিটি চাঁদ শেষ হইয়া পঞ্চম চাঁদের ১০ দিন অতীত হইলেই তাহার ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। আর যদি স্বামীর মৃত্যু চাঁদের ১ম তারিখে না হয়, তবে ৩০ দিনের চারিটি মাস ধরিতে হইবে এবং তারপর দশ দিন ধরিতে হইবে। (মোট ১৩০ দিন অতীত হইলে ইদ্দত পূর্ণ হইবে। ইহা ত হইল মওতের ইদ্দতের হুকুম।) তালাকের ইদ্দতের হুকুমও ঠিক এইরূপ। অর্থাৎ, ঋতুবতী বা গর্ভবতী মেয়েলোক না হইলে তাহার মাস হিসাবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। অতএব, যদি চাঁদের ১ম তারিখে তালাক দেয়, তবে তিনটি চাঁদ অতীত হইয়া গেলেই ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। চাঁদ ২৯ দিনের হউক বা ৩০ দিনের হউক। (চাঁদের বেশী-কমের কারণে ২/১ দিন বেশী কম হইলে তাহা হিসাবে ধরা যাইবে না) আর যদি চাঁদের ১ম তারিখে ছাড়া তালাক হয়, তবে ৩০ দিনের হিসাবে মাস ধরিয়া পূর্ণ ৯০ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে। [প্রকাশ থাকে যে, আমাদের ইসলামী শরীঅতে সবক্ষেত্রেই চান্দ্র মাসের এবং চান্দ্র বৎসরের হিসাব ধরা হয়। চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিনে হয়। সৌরবৎসর ৩৬৫ দিনে হয়, কাজেই চান্দ্র বৎসরের চেয়ে সৌরবৎসর ১১ দিন বেশী।

৫। **মাসআলা ঃ** শরার বরখেলাফ কাহারও বিবাহ হইল, যেমন, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হইয়াছিল বা ভগ্নীপতির বিবাহ বন্ধনে ভগ্নী থাকা সত্ত্বেও ভগ্নীপতির সহিত বিবাহ হইয়াছিল (বা অন্য স্বামীর ইদ্দতের ভিতর বিবাহ হইয়াছিল), তারপর এই শরার বরখেলাফকারীর মৃত্যু হইয়া গেল। এইরূপ অবস্থা হইলে ঐ স্ত্রীলোকটির তখন চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না; (কারণ সে ত তাহার স্বামীই নয়। অবশ্য অন্যায়রূপে সে এই স্ত্রীলোকটির উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া পবিত্র হওয়ার জন্য) তাহার তিন হায়েয বা হায়েয না আসিলে তিন মাস আর গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** মৃত্যু-শয্যায় যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বায়েন তালকা দেয় এবং তালাকের ইদ্দত শেষ না হইতেই স্বামীর মৃত্যু হইয়া যায়, তবে ঐ স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত এবং মৃত্যুর ইদ্দত এই দুইটির যেইটি পরে শেষ হইবে সেই পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে আর যদি রজয়ী তালাক দিয়া ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায়, তবে অবশ্যই মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে। (আর যদি উভয় ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দতের পর মৃত্যু হয়, তবে আর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** (বিদেশে) স্বামী মারা গিয়াছে, স্ত্রী খবরও পায় নাই, খবর হয়ত মৃত্যুর চার মাস দশ দিন পর (বা স্ত্রী গর্ভবতী হইলে প্রসবের পর) পাইয়াছে। এমতাবস্থায় খবর পাওয়ার পর আর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। বে-খবরীর অবস্থায়ই ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। স্বামী তালাক দিয়াছে কিন্তু স্ত্রী জানিল না বা অনেক দিন পর খবর পাইল ইদ্দতের মুদ্দত খবর পাওয়ার পূর্বেই শেষ হইয়াছে তবে তাহার ইদ্দত পুরা হইয়া গেল, এখন ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী হয়ত বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, ইত্যবসরেই স্বামী মারা গিয়াছে এই অবস্থায় সংবাদ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর নিজালয়ে চলিয়া আসিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** (তালাকের ইদ্দতের খোরাক-পোশাক স্বামীর যিম্মায়; কিন্তু) মৃত্যুর ইদ্দতের খোরাক-পোশাক স্বামীর যিম্মায় নয়, নিজ হইতে খরচ করিবে।

১০। **মাসআলা ঃ** কোন কোন স্থানে প্রথা আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর বৎসরকাল ইদ্দত পালনের ন্যায় বসিয়া থাকে। ইহা একেবারে হারাম।

শোক প্রকাশের বিধান

১। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীলোককে রজয়ী তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহার ইদ্দত এই যে, তিনটি হায়েয অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত সে স্বামীর বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার জন্য সীতা পাটি এবং সুরমা, খোশ্‌বু ব্যবহার সবই জায়েয আছে। আর যে স্ত্রীলোকের এক তালাক-বায়েন বা তিন তালাক হইয়াছে, অথবা অন্য কোন প্রকারে বিবাহ টুটিয়া গিয়াছে, অথবা স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তাহার হুকুম এই যে, সে ইদ্দতের মুদ্দতের মধ্যে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্রও যাইবে না, অন্য স্বামীও গ্রহণ করিবে না, সীতা-পাটি এবং সুগন্ধি তৈলও ব্যবহার করিবে না। এই কাজ তাহার জন্য হারাম। এইসব অবস্থায় বিনা পরিপাটিতে মলিন বেশে আবদ্ধ থাকাকেই শোক করা বলে।

২। **মাসআলা ঃ** যতদিন ইদ্দত শেষ না হয়, ততদিন পর্যন্ত সুগন্ধি তৈল বা আতর ব্যবহার করা, কাপড়ে সুগন্ধি লাগান, অলঙ্কার পরিধান করা, নাকফুল পরিধান করা, সুরমা লাগান, পান খাইয়া মুখ লাল করা, পাউডার লাগান, মাথায় ও শরীরে তৈল লাগান, চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়ান, মেহেদী লাগান, সুন্দর কাপড় পরা, রেশমী বা চটকদার রঙ্গীন কাপড় পড়া হারাম। অবশ্য যে-রঙ্গের মধ্যে চমক নাই সে রং জায়েয আছে। মোটকথা, ইদ্দতের শোকের মধ্যে সাজসজ্জা জায়েয নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণে যদি তৈল লাগান দরকার হয়, তবে খোশ্‌বু ছাড়া তৈল ব্যবহার করা দুরুস্ত আছে। এইরূপ দরকারবশতঃ সুরমাকে ঔষধরূপে ব্যবহার করা জায়েয আছে বটে, কিন্তু রাত্রিতে লাগাইয়া আবার দিনে মুছিয়া ফেলিবে। আর মাথা ধোয়া ও গোসল করা দুরুস্ত আছে। একান্ত দরকার হইলে মাথা আঁচড়াইতেও পারে, কিন্তু পরিপাটি করিয়া খোপা বাধিবে না বা চিকন চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া চুলকে এমন পালিশ করিবে না যাহাতে বেশী সুন্দর দেখায়।

৪। **মাসআলা ঃ** শোক প্রকাশ করা বালেগা স্ত্রীলোকের উপর ওয়াজেব, না-বালেগাদের জন্য উহা ওয়াজেব নহে। উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলি তাহারা করিতে পারে। তবে দ্বিতীয় বিবাহ করা এবং বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাওয়া ইহাদের জন্যও দুরুস্ত নহে।

৫। **মাসআলা ঃ** যাহার বিবাহ শরীঅত মতে শুদ্ধ হয় নাই, শরীঅতের বরখেলাফ হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে কিংবা এই পুরুষ মরিয়া গিয়াছে, তবে এমন স্ত্রীর শোক প্রকাশ ওয়াজেব নহে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী ছাড়া অন্য কেহ মরিলে শোক প্রকাশ করা দুরুস্ত নহে। স্বামী নিষেধ না করিলে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত সাজসজ্জা না করা দুরুস্ত আছে, তিন দিনের বেশী করা হারাম। স্বামী নিষেধ করিলে তিন দিনও করা যাইবে না।

খোর-পোশের বয়ান

১। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীর খোরাক-পোশাক দেওয়া পুরুষের উপরে ওয়াজেব। স্ত্রীর টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি যতই থাকুক না কেন, তাহার খরচ-পত্রের জন্য পুরুষ দায়ী। বাস করিবার ঘরের জন্যও পুরুষ দায়ী।

২। **মাসআলা ঃ** বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীকে বাড়ীতে নেওয়া হয় নাই, তবুও স্ত্রী খোর-পোশের জন্য দাবী করিতে পারে। কিন্তু পুরুষ যদি বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী যায় নাই, তবে স্ত্রী খোর-পোশের দাবী করিতে পারে না।

৩। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী এত ছোট যে, সঙ্গম করিবার উপযুক্ত হয় নাই, এই অবস্থায় পুরুষ যদি নিজের কাজ-কর্মের জন্য বা মনকে খুশী করার জন্য তাহাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া রাখে, তবে পুরুষের উপর তাহার খোরাক-পোশাক ওয়াজেব হইবে। আর যদি না রাখে, বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, তবে ওয়াজেব হইবে না। আর যদি স্বামী না-বালেগ হয় এবং স্ত্রী বড় হয়, তবে খোরাক-পোশাক পাইবে। —উঃ বেঃ ৬১ পৃঃ

৪। **মাসআলা ঃ** যে পরিমাণ মহর প্রথমতঃ দেওয়ার প্রথা আছে, উহা সম্পূর্ণ না দেওয়ায় স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে যায় না, এই রকম অবস্থায় স্ত্রী খোরাক-পোশাক পাইবে। আর যদি বিনা কারণে স্বামীর বাড়ীতে না যায়, তবে খোরাক-পোশাক পাইবে না। যখন হইতে স্বামীর বাড়ীতে যাইবে, তখন হইতে দেওয়া হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** স্বামী হইতে যত দিনের অনুমতি লইয়া মা-বাপের বাড়ীতে থাকিবে, স্বামীর নিকট হইতে ততদিনের খোরাক-পোশাক লইতে পারে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীর অসুখ হইলে সেই অবস্থায় স্বামীর বাড়ীতে থাকুক বা অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ীতেই থাকুক, অসুখের সময়ের খোরাক-পোশাক সে পাইবে। আর অসুখ অবস্থায় যদি স্বামী তাহাকে বাড়ীতে নিতে চায় আর সে না যায়, তবে পাইবে না। অসুখ অবস্থায় শুধু খোরাক-পোশাক পাইবে বটে, চিকিৎসার খরচ সে নিজে দিবে। আর যদি পুরুষ দেয়, তবে উহা তাহার অনুগ্রহ।

৭। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী হজ্জ করিতে গেলে এই সময়ের খোরাক-পোশাকের জন্য স্বামী দায়ী নহে। যদি স্বামী সঙ্গে থাকে, তবে স্বামীই উহা বহন করিবে। কিন্তু খোরাকী বাবদ বাড়ীতে যে পরিমাণ পাইত ঐ পরিমাণই পাইবে। অতিরিক্ত লাগিলে উহা নিজে খরচ করিবে। যানবাহনের ভাড়াও নিজে বহন করিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** খোরাক-পোশাকের বেলায় উভয়ের অবস্থার দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে। যদি উভয়েই ধনী হয়, তবে আমীরের মত খোরাক-পোশাক পাইবে, যদি উভয়ে গরীব হয়, তবে গরীবের ন্যায় পাইবে। আর যদি স্বামী গরীব স্ত্রী ধনী বা স্বামী ধনী, স্ত্রী গরীব হয়, তবে মাঝামাঝি রকমের খোরাক-পোশাক পাইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীর যদি এমন কোন অসুখ থাকে যে, ঘর সংসারের কাজ করিতে পারে না অথবা বড় ঘরের মেয়ে হয়, তাই সে নিজে ধোয়া, ঘসা-মাজা রান্না ইত্যাদি কাজ নিজ হাতে

করিতে পারে না বা ঐ সব করাকে দূষণীয় মনে করে, তবে তাহাকে রান্না-বান্না করাইয়া খাওয়াইতে হইবে। অন্যথায় বাড়ীর কাজ-কর্ম স্ত্রীর নিজ হাতে করা ওয়াজেব। স্বামী লাকড়ী, আনাজ, বরতন ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবে, স্ত্রী নিজে পাক করিয়া খাইবে।

১০। মাসআলা ঃ তৈল, চিরুণী, সাবান, ওযূ-গোসলের পানি, ধোওয়া মাজার পানি ইত্যাদি ব্যবস্থা করা পুরুষের উপর ওয়াজেব। কিন্তু পান, তামাক, সুরমা মিশী ইত্যাদি পুরুষের উপর ওয়াজেব নহে। ধোপা খরচও পুরুষে দিবে না, যদি সে দেয় এটা তাহার অনুগ্রহ।

১১। মাসআলা ঃ ধাত্রী ও প্রসব করাইবার খরচ, যে ধাত্রীকে ডাকিয়া আনে সেই দিবে। যদি স্বামী ডাকিয়া আনিয়া থাকে, তবে স্বামী, আর যদি স্ত্রী ডাকিয়া আনে তবে স্ত্রীই দিবে। আর যদি বিনা ডাকে আসিয়া থাকে, তবে পুরুষই ঐ খরচ-বহন করিবে।

স্ত্রীর জন্য ঘর

১। মাসআলা ঃ স্ত্রীকে পৃথক একখানা ঘর দেওয়াও স্বামীর যিম্মায় ওয়াজেব অর্থাৎ এমন একখানা ঘর বা কামরা দেওয়া চাই যে, তথায় স্বামীর মা-বাপ, ভাই, বোন, ভগ্নে, ভাতিজা কেহ যেন না থাকে। স্বামী-স্ত্রী যেন পূর্ণ স্বাধীনভাবে তথায় আচার-ব্যবহার উঠা-বসা করিতে পারে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্ব-ইচ্ছায় এই হক মাফ করিয়া দিয়া শরীকী ঘরে থাকিতে চায়, তবে স্বামীর গোনাহ্ হইবে না।

২। মাসআলা ঃ স্ত্রী স্বাধীনভাবে তাহার মাল-আসবাব কাপড়-চোপড় রাখিতে এবং বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারে, অন্য কেহ তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে না পারে এই পরিমাণ কামরা ঘরই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশীর দাবী করার হক স্ত্রীর নাই ।

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রীর যেমন হক আছে যে, সে স্বামীর নিকট হইতে এমন ঘর দাবী করিয়া নিবে যথায় স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন থাকিতে বা আসিতে না পারে, তদ্রূপ স্বামীরও হক আছে যে, সে যে ঘর স্ত্রীকে দিয়াছে তথায় স্ত্রীর কোন আত্মীয়কে এমনকি তাহার মা-বাপকেও ঢুকতে বা থাকিতে না দেয়।

৪। মাসআলা ঃ স্ত্রী তাহার মা-বাপকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবার যাইবার হক আছে তাছাড়া অন্যান্য মাহ্রাম রেশ্তাদারদের (যেমন, আপন চাচা,আপন মামু, আপন ভাই ইত্যাদিকে) দেখার জন্য বৎসরে একবার যাইবার হক আছে, এর বেশী নয়। এইরূপ মা-বাপও সপ্তাহে একবার এবং অন্যান্য মাহ্রাম রেশ্তাদার বৎসরে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারে তাহাতে বাধা দিবার অধিকার স্বামীর নাই। ইহা অপেক্ষা বেশী আসিতে নিষেধ করার ক্ষমতা স্বামীর আছে।

৫। মাসআলা ঃ বাপের যদি রোগ হয় এবং তাহার খেদমত করার জন্য কেহ না থাকে, তবে আবশ্যক মত দৈনিক বাপের খেদমতে যাইতে পারিবে, স্বামী তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। বাপ যদি বে-দ্বীন কাফেরও হয় তাহারও হক আছে। স্বামী যদি নিষেধ করে, তবুও যাওয়া চাই; কিন্তু স্বামীর আদেশ ছাড়া গেলে খোরপোশ পাইবে না।

৬। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের জন্য গায়ের মাহ্রামদের বাড়ীতে যাওয়া আদৌ উচিত নহে। বিবাহ-শাদীর সময় যদি স্বামী এজাযতও দেয়, তবুও যাওয়া দুরুস্ত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামী যদি এজাযত দেয়, তবে স্বামীও গোনহ্গার হইবে। এমনকি, বিবাহ-শাদীর মাহ্ফেলের সময় মাহ্রাম রেশ্তাদারের বাড়ীতে যাওয়াও দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেও ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর নিকট ভাত কাপড় এবং ঘর পাওয়ার হক্‌দার; অবশ্য মউতের ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর নিকট ভাত কাপড় বা ঘর পাওয়ার হক্‌দার নহে; কিন্তু জওযিয়তের অংশ তাহার স্বামীর প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই আছে। (এমন কি ঘর-দুয়ার বিছানা-পত্র থাল, বাসনের মধ্যেও আছে।)

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীর গোনাহ্‌র কাজ করার কারণে, যদি বিবাহ টুটিয়া যায়, যেমন, কামভাবের সহিত সতাল পুত্রের গায়ে শুধু হাত দিল, তজ্জন্য তালাক দেওয়া হয় কিংবা বে-দ্বীন হইয়া গেল, তবে ইদ্দতের খোরাক-পোশাকের দাবী সে করিতে পরিবে না। অবশ্য থাকিবার ঘর পাইবে কিন্তু যদি স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় চলিয়া যায়, তবে স্বতন্ত্র কথা, পরে আর দেওয়া হইবে না।

নছব ছাবেত হওয়ার কথা

১। **মাসআলা ঃ** স্বামীওয়ালা স্ত্রীর সন্তান হইলে স্বামীকেই সন্তানের বাপ বলিতে হইবে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের কারণে ইহা বলা জায়েয হইবে না যে, এই সন্তান তাহার স্বামীর নহে, অমুকের অথবা এই সন্তান হারামী; যদি কেহ এরূপ বলে, তবে শরীঅতের বিচার অনুসারে তাহাকে কোড়া লাগাইতে হয়। (এমনকি স্বয়ং স্বামীও এই সন্তানকে অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি চারিজন সাক্ষীর প্রমাণ ব্যতিরেকে সন্তানকে অস্বীকার করে, তবে তাহারও হয় তোহ্‌মতের শাস্তি (৮০ দোর্রা) ভোগ করিতে হইবে, 'না হয়, লেআন' করিতে হইবে। (লেআনের বয়ান দ্রঃ)

২। **মাসআলা ঃ** হামলের মুদ্দত কমপক্ষে ছয় মাস এবং অধিকের অধিক দুই বৎসর অর্থাৎ, ছয় মাসের কমে সন্তান হইতে পারে না এবং দুই বৎসরের বেশীও সন্তান পেটে থাকিতে পারে না। (অতএব, যদি বিবাহের পর ছয় মাসের একদিন কম থাকিতেও সন্তান হয়, সন্তানকে হারামী বলিতে হইবে এবং ঐ স্বামীর সন্তান বলা যাইবে না।)

৩। **মাসআলা ঃ** শরীঅতের হুকুম এই যে, (স্ত্রীকে তোহ্‌মত হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং লোকদের ফাহেশা কথার আলোচনা হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং) সন্তানকে যাহাতে হারামী না বলিতে হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য যখন একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়, তখন বাধ্য হইয়া সন্তানকে হারামী এবং সন্তানের মাকে হারামকারিণী বলিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে রজ্‌য়ী তালাক দেয় এবং তালাকের তারিখ হইতে দুই বৎসরের ভিতর সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না, সে সন্তানের বাপ ঐ স্বামীকেই সাব্যস্ত করা হইবে। শরীঅতের আইন অনুসারে এই সন্তানের নছব ঠিক আছে, তাহার নছব বাতেল করা যাইবে না। যদি দুই বৎসরের মাত্র একদিন বাকী থাকিতে সন্তান হয়, তবুও তাহার এই হুকুম। এইরূপ ঘটনা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তালাকের পূর্বেই গর্ভধারণ হইয়াছে । সন্তান দুই বৎসর মাতৃগর্ভে রহিয়াছে, সন্তান হওয়ার পর ইদ্দত শেষ হইয়াছে এবং বিবাহ ছুটিয়াছে। (ইহার পূর্বে ইদ্দতও শেষ হয় নাই এবং বিবাহও ছুটে নাই।) অবশ্য যদি স্ত্রীলোকটি নিজ মুখে স্বীকার করে যে, সন্তান প্রসবের পূর্বেই তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে হারামকারিণী এবং সন্তানকে হারামজাদা বলিতে হইবে। এই রজয়ী তালাকের ছুরতে যদি দুই বৎসরের পরেও সন্তান হয় এবং স্ত্রীলোকটিও ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার না করে, তবে সন্তানের নছব ছাবেত মানিতে হইবে। কেননা, রজ্‌য়ী তালাকের ছুরতে ইদ্দতের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী মিলনের দ্বারা রজআত করা জায়েয আছে, যত বৎসরই হউক না কেন।

মনে করিতে হইবে যে, তালাকের পর ইদ্দতের ভিতর স্বামী-সহবাসের দ্বারা রজআত করিয়াছে, সন্তান হওয়ার পরও তাহার বিবাহ ছুটে নাই। আর যদি স্বামীর ছেলে না হয়, সে বলিয়া দিবে, ইহা আমার ছেলে নহে। যখন অস্বীকার করিবে, তখন লেআনের হুকুম বর্তিবে।

৫। মাসআলা ঃ আর যদি বায়েন তালাক দিয়া থাকে, তবে অবশ্য দুই বৎসরের ভিতর সন্তান হইলে তাহার নছব ছাবেত হইবে, দুই বৎসরের পরে হইলে আর নছব ছাবেত করা যাইবে না, বাধ্য হইয়া সন্তানকে হারামের সন্তান বলিতে হইবে। কিন্তু যদি স্বামী দাবী করে যে, আমারই সন্তান, তবে ছাবেত হইবে এবং মনে করিতে হইবে যে, হয়ত ইদ্দতের ভিতর ভুলে সহবাস করিয়াছে। ইহাতে গর্ভ হইয়াছে।

৬। মাসআলা ঃ যে মেয়ের বালেগা হওয়ার এখনও কোন আলামত পাওয়া যায় নাই কিন্তু বালেগ হইবার নিকটবর্তী হইয়াছে, সেইরূপ মেয়েকে স্বামী তালাক দিলে যদি বায়েন তালাক দেয়, আর মেয়েটি তিন মাসের মধ্যেই গর্ভবতী আছে বলিয়া প্রকাশ করে, তবে নয় মাসের ভিতর সন্তান হইলে হালালের সন্তান মনে করিতে হইবে ; আর যদি রজয়ী তালাক দেয়, তবে ২৭ মাসের ভিতর সন্তান হইলে হালালের অর্থাৎ ঐ স্বামীর সন্তান সাব্যস্ত করিতে হইবে। সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না। অবশ্য যদি বায়েন তালাক দিয়া থাকে এবং ইদ্দতের মধ্যে গর্ভের কথা প্রকাশ না করিয়া থাকে এবং নয় মাসের পরে গিয়া সন্তান হয়, তবে বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহার যদি দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান হয়, তবে সেই সন্তানকে হালালের সন্তান বলিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসবের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার কথা নিজ মুখে স্বীকার করিয়া থাকে অথবা দুই বৎসর পরে গিয়া সন্তান হয়, তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, হালালের সন্তান নয়, হারামের সন্তান।

তাম্বীহ্ ঃ মূর্খ সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর নয় মাসের বেশী এক দুই মাস হইয়া সন্তান জন্মিলেও মেয়েলোকটিকে খামাখা তোহ্মত লাগাইতে থাকে। উপরোক্ত মাসআলার দ্বারা বুঝা গেল যে, ঐরূপ অনর্থক তোহ্মত লাগান জায়েয নহে।

৮। মাসআলা ঃ বিবাহের পর ঠিক ছয় মাসের পরদিন অথবা তাহার দুই এক দিন বেশী হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সে সন্তানকে হালালের সন্তান বলিতে হইবে (হারামের বলা দুরুস্ত নহে)। অবশ্য যদি ছয় মাসের কমে হয়, তখন বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে বা স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে 'লেআন' করিতে হইবে।

৯। মাসআলা ঃ শুধু কলেমা, আক্দ হইয়া যাওয়ার ছয় মাস পরে বৌ উঠাইয়া আনার পূর্বে যদি সন্তান হয়, তবুও সে সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না, ঐ স্বামীর সন্তানই বলিতে হইবে। অবশ্য স্বামীর না হইলে স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে লে'আন করিতে হইবে।

১০। মাসআলা ঃ স্বামী অনেকদিন যাবৎ বিদেশে আছে, এমনকি কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে বাড়ী আসে নাই। এদিকে সন্তান পয়দা হইয়াছে। এই সন্তানকে হারামযাদা বলা যাইবে না। স্বামীরই সন্তান বলা যাইবে। সংবাদ পাইয়া যদি স্বামী অস্বীকার করে, তবে লেআনের হুকুম বর্তিবে। (শরীঅতী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে স্বামীর সন্তান বলা যাইবে। মীরাস ইত্যাদির হুকুম তাহার উপর বর্তিবে। ইহার একটি কারণ এই যে, হয়ত কোন সময় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইয়া থাকিবে অথচ অন্য লোক তাহা জানিতে পারে নাই।)

সন্তান পালনের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** সন্তান কোলে থাকা অবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয় তবে বাপ সন্তানকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। সন্তান মায়ের কাছেই থাকিবে; কিন্তু সন্তানের সমস্ত খরচ বাপকেই দিতে হইবে। আর এই অবস্থায় যদি মা সন্তান পালনের ভার গ্রহণ না করে বাপকে দিয়া দেয়, তবে তাহাকে সন্তান পালনের জন্য মজবুর করিতে পারিবে না; এই অবস্থায় সন্তান পালনের ভার বাপের উপরই পড়িবে।

২। **মাসআলা ঃ** মা না থাকা অবস্থায় কিংবা থাকিলেও যদি ভার নিতে অস্বীকার করে, তবে সন্তান পালনের হক নানীর বেশী, তারপর পরনানী, তারপর দাদীর, তারপর পরদাদীর, তারপর সহোদরা ভগ্নীর, তারপর বৈপিত্রেয়া ভগ্নীর, তারপর বৈমাত্রেয়া ভগ্নীর, তারপর খালার, তারপর ফুফুর।

৩। **মাসআলা ঃ** মা যদি সন্তানের মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করে তবে ঐ সন্তানের লালন-পালনের হক মার থাকে না। অবশ্য যদি সন্তানের মাহ্‌রামের সহিত বিবাহ হয় যেমন, সন্তানের চাচা কিংবা এ ধরনের অন্য কোন আত্মীয়, তবে সন্তানের লালন পালনের হক মার থাকিয়া যায়। মা ব্যতীত অন্যান্য মেয়েলোক যেমন সন্তানের ভগ্নী, খালা ইহাদের যদি কোন বেগানা পুরুষের সহিত বিবাহ হয় তাহাদেরও এই হুকুম অর্থাৎ শিশুর লালন-পালনের হক তাহাদের থাকে না।

৪। **মাসআলা ঃ** বেগানার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর সন্তান পালনের হক চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পর হয়ত স্বামী তালাক দিয়া দিয়াছে অথবা মারা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পুনরায় সন্তান পালনের ভার পাইবার অধিকারিনী হইবে মা এবং তৎপরবর্তী হক্‌দারগণ।

৫। **মাসআলা ঃ** সন্তান পালনের জন্য তাহার মা, নানী, খালা, ফুফু ইত্যাদি কোন মেয়েলোক যদি না থাকে, তবে সন্তান পালনের ভার পুরুষ ওলীদের উপর পড়িবে। প্রথমে বাপ, তারপর দাদা, তারপর ভাই, তারপর চাচা ইত্যাদি যেরূপ তরতীব বিবাহের বয়ানে লেখা হইয়াছে। কিন্তু যদি আত্মীয়গণ না-মাহ্‌রাম হয় এবং সন্তানকে তাহার হাতে সোপর্দ করায় ভবিষ্যতে কোন অনিষ্টের আশংকা থাকে, তবে এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করিবে, যেখানে সব দিক দিয়া নিরাপদ হয়।

৬। **মাসআলা ঃ** পুত্র-সন্তানের লালন-পালনের হক সাত বৎসর পর্যন্ত। যখন ছেলের বয়স সাত বৎসর হইবে, তখন তাহার বাপ তাহাকে জোর জবরদস্তিও মা, নানী ইত্যাদির নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারে। কন্যা-সন্তানের লালন-পালনের হক নয় বৎসর পর্যন্ত। যখন মেয়ের বয়স নয় বৎসর হইবে, তখন তাহার বাপ তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে। মা, নানী প্রভৃতির তাহাকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই।

স্বামীর হকের বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে অনেক বড় বানাইয়াছেন এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক ও অনেক দাবী নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর পক্ষে অতি বড় এবাদত এবং স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা নারায রাখা অতি বড় গোনাহ্।

১। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ○ (مشكوة)

"যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িবে, রমযান মাসের রোযা রীতিমত রাখিবে, রীতিমত পর্দানীতি পালন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে (এবং রীতিমত সন্তান পালন, মুরব্বী ভক্তি ও গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া) স্বামীর তাবেদারী করিয়া চলিবে, বেহেশ্‌তের যে কোন দরওয়াজা দিয়া সে ইচ্ছা করিবে অবাধে তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করা হইবে।" অর্থাৎ, বেহেশ্‌তের ৮টি দরওয়াজা আছে তাহার যে কোন দরওয়াজা দিয়া সে প্রবেশ করিতে চাহিবে, কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

২। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ○ (ابن ماجه)

"যে কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ঈমানের সহিত মরিতে পারিবে, সে নিঃসন্দেহে বেহেশ্‌তী হইবে।"

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍلَّاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ○ (ترمذى)

"যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সজ্‌দা করা জায়েয হইত, তবে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যে, সে তাহার স্বামীকে সজ্‌দা করুক।" (কিন্তু এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করা জায়েয নাই, তাই সজ্‌দা করা এবং এবাদত করার ত হুকুম দেওয়া যায় না, এছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার তাবেদারী এবং পতিভক্তি দেখান স্ত্রীর কর্তব্য।)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে হুকুম করে যে, এই পাহাড়ের পাথরসমূহ বহিয়া ঐ পাহাড়ে এবং সেই পাহাড় হইতে অন্য আর এক পাহাড়ে লইয়া যাও, তবে এই সুকঠিন এবং অনর্থক হুকুম পালনের জন্যও স্ত্রীর তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত।

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের কাজের জন্য ডাকে, তবে স্ত্রী যদি চুলার কাজেও থাকে, তবুও তৎক্ষণাৎ স্বামীর আদেশ রক্ষা করা স্ত্রীর সর্বপ্রধান কর্তব্য।

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি রাত্রে শয়নকালে স্ত্রীকে নিজের কাছে আসার জন্য ডাকে এবং স্ত্রী রাগ করিয়া না আসে, আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে, তবে সারা রাত্রি ফেরেশ্‌তাগণ ঐ স্ত্রীর উপর লা'নত করিতে থাকে।

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তাহার স্বামীকে বিরক্ত করে বা কোনরূপ কষ্ট দেয়, তখন বেহেশ্‌তের যে হূর কিয়ামতের দিন তাহার স্ত্রী হইবে, তাহারা ঐ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, ওহে হতভাগিনী! আল্লাহ্ তোর সর্বনাশ করুন। তুই আর তাঁহাকে কষ্ট দিস্ না, তিনি কয়েক দিন মাত্র তোর নিকট মেহ্‌মান স্বরূপ আছেন, অল্পদিন পরেই তিনি তোকে ছাড়িয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিবেন।"

৮। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

তিন প্রকার লোকের নামায বা অন্য কোন এবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয় না। (১) গোলাম-বান্দী মালিকের নিকট হইতে পলাইয়া গেলে তাহাদের এবাদত বন্দেগী আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না ফিরিয়া আসিয়া মাফ চাহিবে। (২) যে স্ত্রীর স্বামী তাহার উপর অসন্তুষ্ট তাহার কোন এবাদত-বন্দেগী কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে। (৩) মদ্যপায়ী নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কোন এবাদত কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না তাহার নেশা ছুটিয়া যাইবে।

৯। কেহ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞসা করিয়াছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সব চেয়ে ভাল স্ত্রী কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, (১) যে স্ত্রীকে দেখিলে স্বামীর নয়ন জুড়ায়, (২) যে স্ত্রীকে আদেশ করা মাত্রই স্বামীর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করে, (৩) যে স্ত্রী তাহার ইজ্জত বা সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বামীর বিনা হুকুমে বা স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ না করে।

স্বামীর ইহাও একটি হক যে, স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর নিকট এজাযত না লইয়া স্ত্রী নফল রোযা ও নফল নামায না পড়ে। ইহাও স্বামীর একটি হক যে, স্বামীর উপস্থিতিকালে স্ত্রী মলিন বেশে না থাকে; বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসিমুখে সুসজ্জিত হইয়া স্বামীর সামনে আসে। এমন কি, স্বামীর আদেশ সত্ত্বেও যদি স্ত্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়, তবে সেই জন্য প্রহার করিবার অধিকার পর্যন্ত স্বামীর আছে। স্বামীর ইহাও একটি হক যে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীর বাহিরে কোথাও যাইতে পারিবে না, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও না, অন্য কাহার বাড়ীতেও না।

স্বামীর সহিত মিল-মহব্বত রাখিয়া সুখময় জীবন যাপনের উপায়

এই কথা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দুই এক দিনের জন্য নয়, আজীবন স্বামীর সহিত একত্রে বসবাস করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় খোদা না করুন যদি উভয়ের মধ্যে কিছু মন-ভাঙ্গা ভাব আসিয়া যায়, তবে তার চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের আর জগতে নাই। অতএব, স্ত্রীর প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে সে স্বামীর মন অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। ইহার উপায় স্বামীর চোখের ইশারায় চলা। স্বামী যদি হুকুম করে যে, সারারাত্রি হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাক, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিবে। কেননা, দুনিয়া এবং আখেরাত দোজাহানের সুখ লাভ নির্ভর করে স্বামীর মনস্তুষ্টির উপর! কাজেই দুনিয়ার সামান্য একটু কষ্ট ভোগ করিয়া যদি পরম সুখ লাভ করা যায়, তবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কোন সময় এমন কোন কথা বলিবে না বা এমন কোন ব্যবহার করিবে না যাহাতে স্বামীর মনে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইতে পারে। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না বা কোন কাজ করিবে না। এমন কি, স্বামী যদি দিনকে রাত, রাতকে দিন বলে, তবে তাহারও প্রতিবাদ করিবে না।

কোন কোন মেয়েলোক নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পরিণাম চিন্তা না করিয়া এমন কথা বলিয়া বসে বা এমন কাজ করিয়া বসে, যাহাতে হয়ত স্বামীর মনে ময়লা আসিয়া যায়, পরে সারাজীবন কাঁদিয়া কাটায়, (কিন্তু সে কান্নায় কোন ফল ফলে না। 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।') মনে রাখিও, একবার দেলে ময়লা আনিয়া দেওয়ার পর যদি হাত পা ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া

রাযী করিয়াও লও, তবুও পূর্বের মত টাট্‌কা গোলাপ ফুলের সুবাস কি আর হয়? পরেও যখন আবার কোন দিন কোন বিষয় হইবে, তখনই আগের সেই কথা মনে পড়িবে যে, এ'ত সে-ই যে অমুক দিন আমাকে অমুকভাবে মনে আঘাত দিয়াছিল। অতএব, স্বামীর সহিত কথা বলিতে বা ব্যবহার করিতে খুব সতর্ক হইয়া চলা উচিত। কারণ, যেমন, আল্লাহ্ ও রাসূলের খুশীও স্বামীর খুশীতেই, তেমনি নিজের ইহজীবনের এবং পরজীবনের খুশীও স্বামীর খুশীতেই; কাজেই যে ভাবেই হউক না কেন স্বামীর মনকে খুশী রাখিতেই হইবে।

বুদ্ধিমতী মেয়েদের বলিবার ত দরকার করে না, কারণ তাহারা নিজেরাই বুদ্ধি খাটাইয়া যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মরণ রাখার জন্য আমরা কয়েকটি কথা এখানে লিখিয়া দিতেছি। এই কথাগুলি ভালমত স্মরণ রাখিলে এবং পালন করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্যান্য কথা আল্লাহ্ চাহেন ত আপনাআপনি বুঝে আসিতে থাকিবে। যথা— (১) স্বামীর আর্থিক অবস্থার চেয়ে বেশী খরচ করিবে না। (২) স্বামীর যেমন অবস্থা, স্বামী শাক-ভাত মোটা কাপড় যখন যেমন যোগাইতে পারে তাহাতেই হাসি মুখে সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করিবে, কখনও বেশীর আকাঙ্ক্ষা করিবে না বা মুখ বেজার করিয়া থাকিবে না। (৩) যদি কোন সময় কোন কাপড় বা কোন জিনিস পছন্দ হয়, আর স্বামীর আর্থিক অবস্থায় তাহা কুলাইয়া না উঠে, তবে মনের কথা মনেই চাপা দিয়া রাখিবে, কখনও তাহা মুখে আনিবে না ও স্বামীকে ফরমায়েশ করিবে না বা সে জন্য মুখ ভার বা মন ভারও করিবে না। নিজেই মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, যদি আমি স্বামীকে বলি, তবে তিনি মনে করিবেন যে, দেখ সে আমার দিকে একটুও চায় না, আমার যে এত কষ্ট তা সে একটুও বুঝে না। ইহাতে মনে মিল থাকিতে পারে না, স্বামীর মনে আঘাত লাগিতে পারে অথচ স্বামীর মনের কিঞ্চিৎ আঘাতও সাধ্বী-পত্নীর জন্য অতি অধিক। এই জন্যই জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, স্বামী ধনী হইলেও নিজে কোন কিছুর জন্য ফরমায়েশ দেওয়া চাই না, কারণ তাহাতে স্বামীর চোখে একটু পাতলা হইতে হয়। অবশ্য স্বামী যদি নিজ খুশীতে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার মনে কি চায় একটু বল, তবে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় কোন দোষ নাই, কিন্তু তাহাও চাপিয়া চাপিয়া চতুর্দিকে খেয়াল রাখিয়া বলা উচিত। তাহা হইলে স্বামী তোমাকে আপন দরদী মনে করিবে; নতুবা তাহার নজরে তোমার সম্মান ও পজিশন কমিয়া যাইবে। (৪) নিজের কথার উপর কখনও জেদ করিবে না। যদি কোন কথা তোমার মতের বিরুদ্ধেও স্বামী বলেন, তবুও তখন তাহার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। পরে হয়ত সুযোগ মত ঠাণ্ডা সময়ে বুঝাইয়া দিবে বা বুঝিয়া নিবে।

স্বামীর সংসারে খাওয়া পরার কিছু কষ্ট হইলে (বা বাড়ী-ঘর জিনিস, কাপড়, ছুরত, চেহারা মন মত না হইলে তাহাতে কখনও মন কালা বা চেহারা মলিন করিবে না,) মুখে কখনও কিছু বলিবে না; বরং হাসি মুখে ও প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিবে যেন স্বামীর মনে কষ্ট না হয়। তুমি যদি সন্তোষ ভাব প্রকাশ কর, তবে স্বামীর মন তোমার অধিকারে আসিয়া যাইবে।

স্বামী যদি তোমার জন্য কোন জিনিস আনেন এবং তাহা যদি তোমার মনমত না হয়, তবুও খুশীর সঙ্গে তাহাই হাসি মুখে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়া লইও। জিনিস যে তোমার পছন্দ হয় নাই, তাহা ভাষায় বা ভাবে আদৌ কোনরূপ প্রকাশ পাইতে দিও না। কেননা, তাহাতে স্বামীর মন ছোট হইয়া যাইবে এবং আগামীতে কোন জিনিস আনিতে তাহার মন চলিবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি খুশীভাব দেখাও, তবে তাহার মন সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে আরও ভাল ভাল জিনিস আনিবার জন্য

তাহার মনে আগ্রহ জাগিবে। ফলকথা, মনে রাখিবে শোকরে নেয়ামত বাড়ে, না-শোকরীতে এবং শেকায়েতে নেয়ামত পাওয়া ত যায়ই না, তাছাড়া মনেও আঘাত লাগে। ক্রোধ-রিপুর বশীভূত হইয়া কখনও স্বামীর বাড়ীর বা শ্বশুর, শাশুড়ীর নিন্দাবাদ প্রকাশ করিবে না, কখনও না-শোকরী করিবে না। হাদীস শরীফে আছেঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি দোযখের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী দেখিয়াছি। লোকেরা আরয করিল, দোযখে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ কি? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধান দুইটি দোষ আছে, সেই দুইটির কারণেই তাহারা অধিকাংশ দোযখী হইবে। একটি দোষ এই যে, তাহারা সামান্য সামান্য কারণে গালি, বদ-দো'আ এবং অভিশাপ দিতে থাকে। দ্বিতীয় দোষ এই যে, তাহারা পরের বাড়ীর অর্থাৎ স্বামীর বাড়ীর শেকায়েত ও না-শোকরী বহুত করে। চিন্তা করিয়া বুঝা দরকার যে, না-শোকরী করা বড় গোনাহ্ এবং গালি দেওয়া, লা'নত করা, অভিশাপ দেওয়া, বদ-দো'আ দেওয়া কত বড় গোনাহ্! এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত দরকার।

স্বামী যদি রাগান্বিত হয়, তবে তুমি এমন কোন কথা বলিবে না এমন কোন ব্যবহার করিবে না যাহাতে তাহার রাগ আরও বৃদ্ধি পায়; বরং এমন ব্যবহার করিবে যাহাতে তাহার রাগ থামিয়া যায়। সব সময় মাথা খাটাইয়া মেযাজ বুঝিয়া কথা বলিবে। যদি বুঝ যে, এখন হাসি চাতুরীতে সন্তুষ্ট হইবে, তবে হাসি চাতুরীর কথা বলিতে দোষ নাই। আর যদি দেখ যে, এখন হাসি চাতুরী ভালবাসিবে না, তবে তখন কিছুতেই হাসি চাতুরীর কথা বলিবে না। ফলকথা এই যে, মেযাজ বুঝিয়া চলা দরকার। স্বামী যদি কোন সময় গোস্বা করিয়া কথা না বলে, তবে তখন তুমিও মুখ ফুলাইয়া বসিয়া থাকিবে না; বরং খোশামোদ তোষামোদ করিয়া কাকুতি নিমতি করিয়া হাত জুড়িয়া পা ধরিয়া অপরাধ না হইলেও অপরাধ স্বীকার করিয়া স্বামীর অন্যায় হইলেও তুমি তোমার নিজের অন্যায় স্বীকার করিয়া মাফ চাহিবে এবং যে প্রকারেই হউক না কেন স্বামীর মন সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিবে। কখনও তুমি গোস্বা করিবে না বা বেজার হইয়া বসিয়া থাকিবে না; বরং স্বামীর হাত পা ধরিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাকেই প্রকৃত সম্মান মনে করিবে।

নিশ্চয় জানিও, স্বামীর সহিত আপনাআপনি প্রণয় ও মহব্বত হয় না প্রাণপণে স্বামীর খেদমত করিতে হয়, অন্তঃকরণের সহিত স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, প্রাণে সব সময় স্বামীর ভয় ও আদব রাখিতে হয়। নির্বোধ মেয়েলোক বড় বংশের বা রূপের বা আধুনিক কুশিক্ষার গৌরব করিয়া হয়ত স্বামীকে হেয় বা নিজকে স্বামীর সমান সমান বলিয়া মনে করিয়া বসে। নিশ্চয় জানিও, ইহা অতি বড় বে-আদবী। স্বামী হয়ত ভদ্রতা, নম্রতা বা প্রেম পরবশ হইয়া তোমার কোন খেদমত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু খবরদার! তুমি যদি মানুষ হও, তোমার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকে, তবে কস্মিনকালেও স্বামীর কোন খেদমত লইবে না। মনে কর কোন পিতা যদি ছেলের পা বা শরীর টিপিতে বা পাখা করিতে বা জুতা বাড়াইয়া দিতে থাকে, তখন ছেলে যদি মানুষ হয়, তবে কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। ছেলের তুলনায় বাপ যত বড় পদের, স্ত্রীর তুলনায় স্বামী তাহা অপেক্ষা অনেক বড় পদের। কাজেই স্বামীর খেদমত স্ত্রী কিরূপে লইতে পারিবে? অতএব, কথাবার্তা, চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা সব কাজেই স্বামীর আদব রক্ষা করিয়া চলা স্ত্রীর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। যদিও স্বামী হাসি-ঠাট্টা করিবে, কিন্তু তবুও স্ত্রীর সে হাসি-ঠাট্টাতে ভুলিয়া স্বামীর মর্তবার কথা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি স্বামীরই অন্যায় হয়, তবে ত তাহাও ধরা চাই না। নিজেরই অন্যায় না

হইলেও অন্যায় স্বীকার করা উচিত, কারণ ইহাতে স্বামীর মন সন্তুষ্ট হইবে। বিশেষতঃ যদি নিজেরই অন্যায় হয়, তবে ত কিছুতেই রাগ গোস্বা করিবে না, তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লওয়া উচিত। অন্যথায় একবার স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ভাঙ্গা মনকে জোড়া লাগান অনেক কষ্ট।

স্বামী যখন বিদেশ হইতে বা বাহির হইতে বাড়িতে আসেন, তখন অন্য সব কাজ পরিত্যাগ করিয়া আগে আসিয়া স্বামীর সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত এবং উপস্থিত হইয়া যাহাতে তাহার ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং কষ্ট দূর হয় সেইরূপ কথা বলিবে এবং সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে, আর প্রাণপণে খেদমতে লাগিয়া যাইবে। কখনও নিজের গরজের কথা বা শাশুড়ী-ননদের ঝগড়ার কথা বলিবে না। কোথায় কি খাইয়াছেন? কোথাও কোন কষ্ট পাইয়াছেন না কি? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে। পানির দরকার হইলে পানি আনিয়া দিবে। ক্ষুধা থাকিলে জলদী খাবার যোগাড় করিয়া দিবে। গরমের দিন হইলে পাখা করিবে, হাত-পা টিপিয়া দিবে, ওযূর পানি, জুতা, খড়ম আনিয়া দিবে, কোন কাজ আছে নাকি জিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার জন্য কি আনিয়াছেন? টাকার থলি কোথায়? বাক্সের মধ্যে কি? ইত্যাদি বিরক্তিজনক কথা কিছুতেই বলিবে না। তিনি কিছু আনিয়া থাকিলে নিজেই যখন দিবেন, তখন যা দেয় তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে হাসিমুখে গ্রহণ করিবে, কোনরূপ অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। অবশ্য যদি কোন কিছুর দরকার থাকে বা স্বামীর অবহেলা অমিতব্যয়িতা, অপরিণামদর্শিতা বা অকর্মন্যতা সম্বন্ধে কিছু বুঝ দিতে হয়, তবে অন্য সময় মেযাজ যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন ধীর ও নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিবে।

স্বামীর মা-বাপ অর্থাৎ তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের খেদমত করিয়া তাঁহাদের মন সন্তুষ্ট রাখাকে তোমার বড় ফরয মনে করিবে। এমন কি, স্বামী টাকা-পয়সা রোযগার করিয়া আনিয়া যদি তোমার কাছে না দিয়া তাহাদের কাছে দেন তাহাতে তুমি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইবে না বা হাবভাবেও কোন বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবে না; বরং তোমার কাছে দিলেও তোমার বলা উচিত যে, আম্মা মুরুব্বি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে দেন কেন? আম্মার হাতে দেওয়াই ভাল। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করাতে কোন অপমান বা গৌরবের হানি মনে করিবে না; বরং ইহাতেই প্রকৃত সম্মান এবং সমাদর পাওয়া যাইবে মনে রাখিবে। শাশুড়ী, ননদ হইতে পৃথক হইয়া জীবন যাপন করার কথা কখনও উত্থাপন করিবে না। যদি কোন সময় মনে সেরূপ ভাবনা আসেও, তবে তাহাকে শয়তানের অছঅছা মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিবে। এরূপ খেয়ালকে মনের কোণেও জায়গা দিবে না। শাশুড়ী-ননদের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিবে। বিশেষতঃ ননদের কারণেই সাধারণতঃ শাশুড়ীর মন খারাপ হয়, তারপর নানা কথা কয়। শাশুড়ী, ননদের কোন ব্যবহারে বা কথায় যদি মনে কিছু ব্যথা লাগে, তবে নীরবে তাহা সহ্য করিবে, সে সব কথা আবার মা-বাপের কাছে গিয়া কখনও বলিবে না। কারণ এইরূপ কূটনামিতে লাভ কিছু নাই, শুধু ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং জিন্দিগী বিষময় হইয়া উঠে। তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার শাশুড়ী আম্মা কত কষ্ট করিয়া তোমার স্বামীকে লালন-পালন করিয়াছেন এবং কত আগ্রহ করিয়াছেন যে, বৌকে দেখিবেন এবং বুড়াকালে বৌ-এর কিছু খেদমত পাইবেন আশা করিয়া ছেলেকে বিবাহ করাইয়াছেন। এখন সে ছেলে যদি ভিন্ন হইয়া যায়, তবে তাতে তাঁহার মনে কত কষ্ট হয় এবং সেই কষ্টের রাগটা গিয়া পড়ে তোমার উপর যে, এমন বৌ আনিয়াছি যে, সে দুই দিনেই আমার সোজা ছেলেকে নিজের

বশ করিয়া লইয়াছে, আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। খবরদার! এইরূপ কথা যেন মনে কখনও না হয়, এমন দোষে এবং এমন অভিশাপে যেন তুমি কখনও না পড়। বাড়ীর যাল, ননদ, দেওর, ভাসুরের ছেলেমেয়ে, ননদের ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। কাহাকেও মন্দ জানিবে না বা কাহারও প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিবে না। শুরু হইতেই আদব-লেহাযের এবং ছবর বরদাস্তের আচার ব্যবহার করিবে। যাহারা বড় তাহাদের সম্মান করিবে এবং যাহারা ছোট তাহাদের স্নেহ করিবে। নিজের হিস্বামত কাজকর্ম রীতিমত করিবে। নিজের কাজ তো কখনও অন্যের ঘাড়ে ফেলিবেই না; বরং অন্যের কাজও কিছু তুমি করিয়া দিবে এবং অন্যের কাজে কিছু ত্রুটি দেখিলে তাহার শেকায়াত করিবে না বা তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। এইরূপ ব্যবহার যদি তুমি কর তাহা হইলে দেখিবে যে, সকলেই তোমাকে ভালবাসিতেছে এবং সমাদর করিতেছে। দুনিয়াতেও ভাল থাকিবে এবং আখেরাতেও ভাল থাকিবে। নতুবা প্রতিযোগিতা করিলে বা বুদ্ধি চালাইলেই অথবা শুধু নিজের স্বার্থ টানিলে বা নিজের গৌরব দেখাইলে কেহই ভালবাসিবে না। শাশুড়ী, ননদেরা বা যালেরা যে কাজ করে, সে কাজ করিতে তুমি কখনও লজ্জা বা অপমান বোধ করিও না; বরং তাহাদের হাতের কাজ তুমিও করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে তাহাদের মন অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

দুইজনকে চুপিচুপি কিছু কথাবার্তা বলিতে দেখিলে তুমি সেখান হইতে সরিয়া যাও, পাছে কান লাগাইয়া তাহাদের কথা শুনিও না বা এইরূপ মনে কু-ধারণা আনিও না যে, তাহারা বুঝি তোমারই সম্বন্ধে কিছু বলাবলি করিতেছে। এইরূপ বদ-খেয়ালীতেই যত মন ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়, কাজেই বদ-খেয়ালী হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

অনেক নির্বোধ মেয়ে এরূপ আছে যে, শ্বশুরালয়ে গিয়া তাহারা সব সময় উদাসীন গমগীন হইয়া বসিয়া থাকে, দুই দিন না যাইতেই বাপের বাড়ী যাইবার জন্য কান্নাকাটা বা মাতলামি শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ করা কিছুতেই উচিত নয়। ইহাতে লোকে পাতলা এবং নির্বোধ বলিয়া মনে করে। বেশী কথা বলিবে না (বা বেশী হাসিবে না, কারণ ইহাতে লোকে বে-হায়া বা নির্বোধ বলিয়া মনে করে) বা ইহাও করিবে না যে, একেবারে কথা বন্ধ করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা এবং খোশামোদ করা সত্ত্বেও উত্তর নাই। ইহাতেও লোকে ভালবাসে না, লোকে মনে করে, আমাদিগকে বুঝি হেয় মনে করে (বা আকল-বুদ্ধি নাই)।

শ্বশুরালয়ে কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হইলে তাহা কখনও মা-বাপের বাড়ীতে কাহারও নিকট বলিবে না। মা-বোনেরা বারবার জিজ্ঞাসা করিবে বটে, কিন্তু তুমি ভাল ছাড়া মন্দ আদৌ প্রকাশ করিবে না। মা-বাপেরও উচিত, মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ীর কোন কথা আসিয়া বলে, খবরদার! তাহাতে যেন তাঁহারা কর্ণপাত না করেন। শেকায়েত অভ্যাসটাই ভাল নহে। শোকরে নেয়ামত বাড়ে; আর শেকায়েতে অশান্তি বাড়ে।

স্বামীর মাল-পত্র, কাপড়-চোপড় খুব যত্ন করিয়া হেফাযত করিয়া রাখিবে। সব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যে জিনিসের যে স্থান সেইখানে সে জিনিস সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিবে। জমাইয়া বা ছড়াইয়া রাখিবে না। কাপড়-চোপড় সুন্দররূপে ভাঁজ করিয়া রাখিবে; মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিবে। বিশেষতঃ পশমী কাপড় অবশ্য রৌদ্রে দিবে। ভাদ্র মাসে অবশ্য সব কাপড়ই রৌদ্রে দিবে। বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লেপার দরকার হইলে লেপিবে। ঝাড়ু দেওয়ার দরকার হইলে ঝাড়ু দিবে। কালির ঝুল ঘরে পড়িতে দিবে না। স্বামীর কাপড় একটু

ময়লা দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া কাপড় লইয়া গিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। বিছানা, বালিশের গেলাফ, লেপের খোল যদি ময়লা হয় তৎক্ষণাৎ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। যদি না থাকে, তবে সেলাই করিয়া লইবে, যদি কিছু ছেঁড়া থাকে তবে রিফু করিয়া দিবে বা তালি লাগাইয়া দিবে, স্বামীর বলার অপেক্ষা করিও না, বলার আগেই কাজ করিয়া ফেলিও। কারণ বলার আগে করিতে পারিলে সেইটাই তারীফের বিষয় নতুবা বলার দরকার পড়িলে এবং বলার পর করিলে সেটা বেশী তা'রীফের বিষয় নহে।

কখনও কোন কাজ-কর্মে চোরামী বা আলসেমী করিও না, আপন কর্তব্য মনে করিয়া সব কাজ সময়মত কাহারও বলার আগেই করিয়া ফেলিও। কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। কারণ মিথ্যা কথা বলায় গোনাহ্ ত আছেই, তাছাড়া লোকের কাছেও অপমানিত হইতে হয়। খাওয়ার লোভ সামলাইয়া চলিও, সবাইকে খাওয়াইয়া তারপর নিজে খাইও। সব সময় পাক-ছাফ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিও, জিনিস-পত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিও। কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ বা উচ্চবাচ্য করিও না। বিশেষতঃ কোন মুরুব্বি রাগ করিয়া যদি কোন কথা বলেন, তবে খবরদার! সে কথায় উত্তর দিও না, চুপ করিয়া মুখ বুঝিয়া থাকিও। মনে করিও না যে, সমানে সমানে উত্তর না দিলে বুঝি তোমার হার হইয়া গেল, এ কথা ভুল। চুপ করিয়া থাকিলেই দেখিবে যে, পরিণামে তোমার জিত হইবে, সকলে তোমাকে ভাল বলিবে।

স্বামীর যদি কোন স্বভাব মন্দ থাকে সেজন্য স্বামীর খেদমতের ত্রুটিও করিও না, বা স্বামীর সহিত পাল্লা দিয়া চলিও না, বা রাগ করিয়া তাহাকে সোজা করিতে চাহিও না। কারণ, পুরুষের মেযাজ বাঘের মতই হয়। যাঘ রাগ করিলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না, ফাঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। আর যদি কেহ বাঘের কাছে নম্রতা স্বীকার করে, তবে বাঘ তাকে কিছুই করে না। ঠিক এরূপ, স্বামীকে বাধ্য করিতে চাহিলে বা তাঁহার কোন কু-অভ্যাস বদলাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার নিকট খুব নত হইয়া চলিবে। তিনি যা বলেন, গোনাহ্র কাজ না হইলে তাই শুনিবে। কখনও তাঁহার কথার বা মেযাজের খেলাফ কোন কাজ করিবে না। কাহারও নিকট তাঁহার গীবৎ-শেকায়েত করিবে না। এই উপায়ে দেখিবে যে, ক্রমান্বয়ে স্বামী তোমার বশ হইয়া যাইবে, যদি বশ নাও হয়, তবুও অন্ততঃ আখেরাতেও তুমি তোমার ছবরের ফল পাইবে। আর যদি ইহার বিপরীত কর, তবে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় কূলের অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। হাঁ, নম্রভাবে গোপনে কোন বিষয় বুঝ দিতে পারিলে সে ভাল কথা; কিন্তু খবরদার! এমন কোন কথা বলিবে না যাহাতে স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

সন্তান পালনের নিয়ম

ছোট বেলার আদত-আখলাকই সারা জীবন বাকী থাকে। এই জন্যই বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্যন্ত যে স্বভাবগুলি শিক্ষা দেওয়ার এবং অভ্যাসে পরিণত করার দরকার তাহার কিছু আমরা এখানে লিখিয়া দিতেছি যাহাতে মাতাগণ উত্তম ছেলেমেয়ে গঠন করিতে সমর্থ হন।

১। নেকবখ্ত ও দ্বীনদার মেয়ে লোকের দুধ পান করান উচিত। কেননা দুধের আছর চরিত্রের উপর অনেক বেশী পড়ে।

২। মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ ছেলে-মেয়েকে সিপাহীর বা ভয়াল জিনিসের ভয় দেখাইয়া থাকে, এরূপ করিবে না। ইহাতে ছেলে-মেয়ের দেল কমজোর হইয়া যায়, কাপুরুষ হইয়া যায়।

৩। ছেলে-মেয়েদের দুধ পান করার ও খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যেন সুস্থ থাকে।

৪। ছেলে-মেয়েকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। ছেলে-মেয়েকে বেশী সাজাইয়া গুজাইয়া রাখিও না।

৬। ছেলেদের মাথার চুল বেশী লম্বা হইতে দিবে না।

৭। মেয়েরা যে পর্যন্ত পর্দায় থাকিতে অভ্যস্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের অলংকার পরাইও না। কারণ, একে ত এতে জান-মালের উপর আশঙ্কা আছে, তাছাড়া ছোট বেলা হইতে জেওরের প্রতি আকর্ষণ হওয়া ভাল নহে।

৮। ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়া গরীবদের দান করার এবং ভাই-বোনদের এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খাবার জিনিস ভাগ করার অভ্যাস করাইবে। কারণ, ইহাতে ছাখাওতির অভ্যাস বাড়িবে, লোভের অভ্যাস কমিবে। অবশ্য শরীঅত মতে ছেলেরা যেসব বস্তুর মালিক তাহা কাহাকেও দিতে বলা জায়েয নাই। তোমাদের নিজস্ব বস্তু তাহাদের দ্বারা দান করাইবে।

৯। যাহারা বেশী খায় ছেলে-মেয়েদের সামনে তাহাদের দুর্নাম করিবে। কিন্তু কাহারও নাম লইয়া বয়ান করিবে না। এইরূপ বলিবে, যাহারা বেশী খায়, লোকে তাহাদের ঘৃণা করে ইত্যাদি। (ইহাতে ছেলে-মেয়েদের কম খাওয়ার অভ্যাস হইবে।)

১০। ছেলেদের সাদা কাপড়ের অভ্যাস করাইবে এবং রঙ্গীন কাপড়ের নিন্দা করিবে যে, ইহা মেয়েদের পোশাক। তুমি ত পুরুষ তোমার এসব সাজে না।

১১। মেয়েদের সব সময় বা প্রতিদিনই সীতাপাটি এবং বিলাসিতার অভ্যাস করাইবে না। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে, সীমার ভিতরেই সে জিনিস ভাল, সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে সব জিনিসই খারাপ।

১২। ছেলে-মেয়েদের জেদ সব পুরা করিবে না। কারণ, ইহাতে স্বভাব খারাপ হয়। (হট এবং জেদ করার কু-অভ্যাস হয়।)

১৩। ছেলে-মেয়েদের চীৎকার করিয়া কথা বলিতে দিবে না; বিশেষতঃ মেয়েদের ত খুবই তাকীদ করিবে; নতুবা বড় হইয়াও ঐ কু-অভ্যাস থাকিয়া যাইবে।

১৪। যে সব ছেলেদের স্বভাব খারাপ বা লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয় না; (মুরুব্বির আদব রক্ষা করিয়া চলে না; গালাগালি করে বা) সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে বা ভাল ভাল খাবার খায়, এরূপ ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই ছেলে-মেয়েদের মিশিতে দিবে না।

১৫। রাগ, মিথ্যা কথা, হিংসা, চুরি, চুগলি, খামাখা নিজের কথার উপর জেদ করা, বেহুদা কথা বলা, খামাখা হাসা বা বেশী হাসা, কাউকে ধোঁকা দেওয়া, ভাল-মন্দ আদব-তমীয বিবেচনা না করিয়া কথা বলা ইত্যাদি দোষগুলির প্রতি ছেলে-মেয়েদের যাহাতে আন্তরিক ঘৃণা জন্মে সেইরূপ উপদেশ দিবে (এবং ঘটনা শুনাইয়া ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাবের ছবি তাহাদের হৃদয় পটে আঁকিয়া দিবে।) যখনই কোন একটি দোষ দেখিবে তখনই তাম্বীহ্ করিবে এবং বুঝাইয়া উপদেশ দিবে।

১৬। ছেলে-মেয়েরা অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলে বা নষ্ট করিয়া ফেলে বা কোন ছেলে-মেয়েকে যদি দুষ্টামি করিয়া মারে বা গালি দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার

শাস্তির ব্যবস্থা করিবে যেন আগামীতে এরূপ কাজ আর না করে; নতুবা এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিলে ছেলে-মেয়ের স্বভাব চিরতরে খারাপ হইয়া যাইবে।

১৭। ছেলে-মেয়েদের অসময় ঘুমাইতে দিবে না, (সময় মত ঘুমাইতে দিবে এবং সময় মত উঠাইবে।)

১৮। ছেলে-মেয়েদের ঘুম হইতে ভোর সকালে উঠার অভ্যাস করাইবে, (ঘুম হইতে উঠিয়া মুরুব্বিগণকে দেখিলেই নম্রভাবে সালাম করিতে অভ্যাস করাইবে।)

১৯। সাত বৎসর বয়স হইলে নামায পড়ার অভ্যাস করাইবে।

২০। মক্তবে যাওয়ার বয়স হইলে সর্বপ্রথমে কোরআন শরীফ পড়াইবে। (খুব ছোট থাকিতে অনেক পড়ার বোঝা চাপাইয়া দিবে না। ইহাতে যেহেন এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। যেমন বয়স তেমন চাপ দিবে। কিছু দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা আমোদ-স্ফূর্তিও করিতে দিবে। কিন্তু কুসংসর্গে যাইতে দিবে না।)

২১। ছোট বেলার শিক্ষা যাহাতে দ্বীনদার পরহেযগার ওস্তাদের কাছে হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

২২। মক্তবে যাইতে না চাহিলে কখনও প্রশ্রয় বা ঢিল দিবে না। যে প্রকারেই হউক নিয়মিতরূপে মক্তবে যাওয়ার অভ্যাস করাইবে।

২৩। ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে আউলিয়াগণের এবং পয়গম্বরদের কেচ্ছা শুনাইবে।

২৪। ছেলে-মেয়েদের নাটক নভেল, বা আশেক-মাশুকের কেচ্ছা পড়িতে দিবে না (এবং বায়স্কোপ থিয়েটার ও অন্যান্য খেলাফে শরা সভা-সমিতিতে যাইতে দিবে না এবং জীব জন্তুর ফটো বিশেষতঃ উলঙ্গ ছবি কিছুতেই দেখিতে দিবে না।)

২৫। ছেলে-মেয়েদের এরূপ বিষয় পড়িতে দিবে, যাহাতে ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক উপদেশ লাভ হয় এবং দুনিয়ারও আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ হয়।

২৬। ছেলে মক্তব হইতে আসিলে কিছুক্ষণ তাহাকে খেলিবার সময় দিবে (সব সময় পড়াতে লাগাইয়া রাখিবে না। ইহাতে যেহেন কমজোর হইয়া যায়।) কিন্তু এমন খেলা খেলিবে যাহাতে গোনাহ্ না হয়, হাত পা ভাঙ্গিবার আশঙ্কা না থাকে (এবং খারাপ বালকদের সঙ্গে না মিশে)।)

২৭। কোনরূপ বাঁশী, বাদ্য বা আতশবাজি কিনিবার জন্য ছেলেদের পয়সা দিবে না।

২৮। ছেলে-মেয়েদের (বায়স্কোপ, যাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদির) খেল-তামাশা দেখিতে দিবে না।

২৯। ছেলে-মেয়েদের এমন কোন হাতের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিবে, যাহা দ্বারা দরকার পড়িলে হালাল রুজি কামাই করিয়া নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

৩০। (মেয়েদের দুনিয়ার বিদ্যা বা লেখা বেশী শিখাইবে না, যাহাতে চরিত্রের উন্নতি হয় এমন বিদ্যা শিক্ষা দিবে।) লেখা এত পরিমাণ শিখাইবে যাহাতে আবশ্যকীয় হিসাব এবং আবশ্যকীয় চিঠি-পত্র লিখিতে পারে; (হাতের শিল্প কাজ এবং পাকের কাজ বেশী শিক্ষা দিবে)।

৩১। ছেলে-মেয়েদের সব কাজ নিজ হাতে করিবার অভ্যাস করাইবে যাহাতে অকর্মা বা অলস না হইয়া যায়। রাত্রে শুইবার সময় বিছানা নিজ হাতে বিছাইবে। সকালে উঠিয়া নিজ হাতে বিছানা গুটাইয়া রাখিবে। নিজের কাপড়-চোপড়ের হেফাযত নিজেই করিবে। কাপড়ের সেলাই খুলিয়া গেলে বা ছিড়িয়া গেলে নিজ হাতে সেলাই করিয়া লইবে। (যে বাড়ীতে পানি আনার, ধান ভানার অভ্যাস আছে সে বাড়ীতে পানি আনার, ধান ভানার অভ্যাস করাইবে। ভালকথা,

নিজের মালের যত্ন এবং দরদ যাহাতে পয়দা হয় ও সতর্কতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে এবং অকর্মন্য, অলস বা অসতর্ক হইতে দিবে না।)

৩২। মেয়েদের গায়ে যে সব জেওর থাকে তাহা ঘুমাইবার পূর্বে এবং ঘুম হইতে উঠিয়া যেন ভাল করিয়া দেখিয়া লয় যে, ঠিক আছে কিনা, ইহার তাকীদ করিবে।

৩৩। ছেলে-মেয়ের দ্বারা যখন কোন ভাল কাজ হয়, তখন তাহাদিগকে খুব সাবাস দিবে এবং পেয়ার করিবে বরং কিছু পুরস্কার দিলে আরও ভাল হয়। কারণ এই উপায়ে তাহাদের ভাল কাজ করার প্রতি আগ্রহ বাড়িবে। যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সকলের সামনে শরম না দিয়া নির্জনে নিয়া বুঝাইবে যে, দেখ এমন কাজ করিলে সমস্ত লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে, কেহই তোমাকে ভালবাসিবে না, শরীফ লোকেরা এমন কাজ করে না, লোকে বলিবে ছোট লোকের ছেলে, গোনাহ্‌র কাজ করিলে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে ইত্যাদি। নির্জনে বুঝাইবে যাহাতে শরম ভাঙ্গিয়া একেবারে বে-শরম না হইয়া যায়। পুনরায় যদি এরূপ করে, তবে কিছু শাস্তি দিবে।

৩৪। পাক করা, সেলাই করা, চরখা ঘুরান, ফুল বুটা করা, কাপড় রঙ্গান ইত্যাদি যে কাজ বাড়ীতে হয়, মেয়েদের সেই সব খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতে এবং শিখিতে বলিবে।

৩৫। বাপের ভয় ও হায়বত ছেলে-মেয়েদের দেলে পয়দা করা মার কর্তব্য।

৩৬। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-লওয়া বা খেলাধুলা কোন কাজই গোপনে করিতে দিবে না। কারণ, তাহারা যে কাজ গোপনে করে, সে কাজ তাহাদের নিকট মন্দ বলিয়া তাহারা গোপনে করে। অতএব, বাস্তবিকই যদি কাজ মন্দ হয়, তবে ত তাহা করিতেই দিবে না। আর যদি বাস্তবিক পক্ষে মন্দ না হয়, তবে সকলের সামনে তাহা করিতে ক্ষতি কি?

৩৭। পরিশ্রমের কোন না কোন কাজ ছেলে-মেয়েদের জন্য নিয়মিতরূপে নির্ধারিত করিয়া দিবে যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের অভ্যাসও থাকে, কর্ম-প্রিয়তা এবং নিয়মানুবর্তিতাও শিখে। যেমন, ছেলেদের জন্য আধ মাইল বা এক মাইল দৌড়ান, মুগুর চালনা (বোঝা উঠান, কোদাল দ্বারা কোপান, নৌকা চালান, সাঁতার কাটা ইত্যাদি এবং মেয়েদের জন্য চরখা কাটা, যাঁতা পিষা, (ধান ভানা) ইত্যাদি, এইসব কাজ করাতে এই উপকারও আছে যে, এইসব কাজকে ঘৃণা করিবে না।

৩৮। ছেলে-মেয়েদের হাঁটার সময় যেন উপরের দিকে চাহিয়া বা (এদিক ওদিক চাহিয়া বা) অতি তাড়াতাড়ি না হাঁটে, ইহার তাকীদ করিবে (এবং খাওয়ার সময়ও যেন এদিক ওদিক না চায়, খাবার দিকে চাহিয়া ধীরভাবে খায় এবং পথের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে হাঁটে এই অভ্যাস করাইবে)।

৩৯। ছেলে-মেয়েদের নম্রতা, ভদ্রতা শিক্ষা দিবে, ফখর বা গৌরব করিতে দিবে না এবং নিজের কাপড়, নিজের বাড়ী, নিজের বংশ, নিজের বই-পুস্তক, দোয়াত-কলম ইত্যাদির উপর গৌরব করিতে দেখিলেও নিষেধ করিবে (যে, নিজের তারীফ নিজে করিলে ইহাতে গৌরব প্রকাশ পায়, ইহা দূষণীয়)।

৪০। ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছা মত (রাখিবার জন্য বা) কোন জিনিস কিনিয়া লইবার জন্য দুই চারিটা পয়সা দিবে; কিন্তু গোপনে কিনিবার অভ্যাস করিতে দিবে না, (যাহা কিনিবে সাক্ষাতে কিনিবে বা বলিয়া কিনিবে।)

৪১। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-পিয়ার এবং মজলিসে উঠা-বসার আদব কায়দা শিক্ষা দিবে। আমরাও এখানে অল্প কিছু আদব লিখিয়া দিতেছি।

খানাপিনার আদব-কায়দা

খানাপিনার শুরুতে 'বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলিবে, তারপর ডান হাত দিয়া লোকমা ধরিয়া খাইবে এবং (পানির গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা ডান হাতে ধরিয়া পান করিবে।) এক বর্তনে কয়েকজন খাইতে বসিলে নিজের সামনে হইতে খাইবে। (এক মজলিসে কয়েকজন খাইতে বসিলে সকলের সামনে যখন ভাত তরকারী পৌঁছিয়া যাইবে, তখন সকলে এক সঙ্গে "বিসমিল্লাহ্" বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে।) নিজে একা একা আগে খাওয়া শুরু করিবে না, অন্যের খাওয়ার দিকেও তাকাইবে না। অন্যকে খাইতে দেখিলে সেখানে যাইবে না। কেহ কোন খাওয়ার জিনিস দিলে তাহা লইবে না (অবশ্য মুরুব্বির হুকুম হইলে তখন লইবে।) খুব জলদি খাইবে না (এবং অনেক আস্তেও খাইবে না। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে কিন্তু চিবাইবার সময় যেন চপ্ চপ্ শব্দ না হয়।) এক লোক্মা ভাল মত না গিলিয়া আর এক লোক্মা ধরিবে না তরকারীর দাগ যেন কাপড়ে বা বিছানায় না লাগে এবং হাতেও যেন আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা বেশী না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। (মজলিসের আগে খাওয়া হইলে আগে উঠিয়া যাইবে না। এক সঙ্গে উঠিবে বা এজাযত লইয়া উঠিয়া যাইবে। খাওয়ার কোন জিনিস অপছন্দ হইলে তাহা প্রকাশ করিবে না। খাওয়া শেষ হইলে 'আল্হামদু লিল্লাহ' বলিয়া আল্লাহ্র শোকর করিবে।)

মজলিসে উঠা-বসার নিয়ম

(মজলিসে গিয়া নম্রভাবে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলিয়া সকলকে সালাম করিবে। কোন খাছ মুরুব্বি তথায় থাকিলে তাঁহাকে খাছভাবে সালাম করিবে।) নম্রভাবে কথা বলিবে এবং নম্রভাবে বসিবে। মজলিসের মধ্যে থুথু ফেলিবে না বা নাক ছাফ করিবে না। যদি একান্ত দরকার পড়ে, তবে মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া নাক ঝাড়িয়া আসিবে। মজলিসের মধ্যে যদি হাই বা হাঁচি আসে তবে মুখের উপর হাত বা রুমাল রাখিয়া লইবে (হাইয়্যের মধ্যেও আদৌ আওয়াজ না হওয়া চাই,) হাঁচির মধ্যেও যথাসম্ভব কম আওয়াজ করিবে। কাহাকেও পাছে ফেলিয়া বসিও না বা কাহারও দিকে পা মেলিয়া বসিও না। মুখের নীচে হাত লাগাইয়া বসিও না, মজলিসের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাইও না। বার বার কাহারও দিকে তাকাইও না। আদবের সহিত বসিয়া থাকিবে। বেশী কথা বলিও না। কথায় কথায় কছম খাইও না। (নিজের বড়াই দেখাইবার জন্য) নিজে নিজে কথা শুরু করিও না, (অন্যে যখন আদেশ করে তখন শুরু করিও।) অন্যে যখন কথা বলে, তখন তাহার কথা খুব কান লাগাইয়া শুন এবং তাহার কথার মধ্যে কথা বলিও না বা এদিকে-ওদিকে দেখিও না, এরূপ করিলে তাহার অপমান করা হয় এবং মনে কষ্ট পায়। অবশ্য যদি কোন গোনাহ্র কথা গীবৎ-শেকায়েত ইত্যাদি হয়, তবে তাহা শুনিবে না, হয় বন্ধ করিয়া দিবে, না হয় নিজে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। মজলিসের মধ্যে বসা অবস্থায় যদি অন্য কেহ তথায় আসে, তবে একটু সরিয়া তাহার জন্য জায়গা করিয়া দিবে। প্রথম সাক্ষাৎ বা মোলাকাতের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলিয়া সালাম করিবে (এবং নম্রভাবে 'মেযাজ-শরীফ' বা ভাল আছেন ত, বলিয়া

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবে) এবং রোখ্‌ছতের সময় ('আমি এজাযত চাই' বা 'এখন আসি' বলিয়া এজাযত লইয়া) আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া বিদায় হইবে।

॥ কাহার কি হক তাহার বয়ান ॥

মা-বাপের হক

১। মা-বাপ যদি অন্যায়ভাবেও কষ্ট দেয় তবুও মা-বাপকে কষ্ট দিবে না।

২। কথায়, কাজে এবং ব্যবহারে সবক্ষেত্রে মা-বাপের তা'যীম করিবে।

৩। (আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমানির কথা না হইলে) মোবাহ্‌ কাজে মা-বাপের আদেশ অবশ্য পালন করিবে।

৪। মা-বাপ কাফের হইলেও দরকার হইলে তাহাদের ভরণ-পোষণের খেদমত করিবে।

৫। মা-বাপ মারা গেলে আজীবন তাঁহাদের গোনাহ্‌ বখশাইবার জন্য এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিতে থাকিবে এবং নফল নামায, রোযা, তসবীহ্‌, তাহ্‌লীল ইত্যাদি পড়িয়া এবং দান-খয়রাত করিয়া তাঁহাদিগকে ছওয়াব পৌঁছাইতে থাকিবে।

৬। মা-বাপের প্রিয়জনের সহিত (মা-বাপের খাতিরে) ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের উপকার করিবে। তাহাদের খাওয়া পরার অভাব হইলে নিজের শক্তি অনুসারে তাহাদের সাহায্য করিবে।

৭। মা-বাপের ঋণ পরিশোধ করিবে এবং জায়েয অছিয়ত পালন করিবে।

৮। মা-বাপের মৃত্যুর পর চীৎকার করিয়া কাঁদিবে না; কারণ ইহাতে তাঁহাদের রূহের কষ্ট হয়।

দাদা, দাদী এবং নানা, নানীর হক মা-বাপেরই তুল্য। এইরূপে খালা এবং মামুর হক মার তুল্য, চাচা এবং ফুফুর হক বাপের তুল্য। হাদীস শরীফের ইশারায় এইরূপই প্রমাণিত হয়।

দুধ-মার হক

দুধ-মার সহিত আদব তা'যীমের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তাঁহা খাওয়া পরার অভাব হয়, তবে নিজের সাধ্য অনুসারে তাঁহার সাহায্য করিবে।

বিমাতার হক

সতাল মা নিজের জননী মা নন বটে, কিন্তু মার মতই তাঁহার আদব করিতে হইবে এবং যেহেতু তিনি পিতার প্রিয়জনের মধ্যে একজন প্রধান প্রিয়া, কাজেই তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার এবং জানে-মালে তাঁহার খেদমত করিতে হইবে।

ভাই-বোনের হক

হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বড় ভাই পিতৃ-তুল্য। অর্থাৎ, ছোট ভাই বড় ভাইকে পিতার ন্যায় সম্মান করিবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বড় ভাই ছোট ভাইকে সন্তানের ন্যায়

স্নেহ করিবে। এইরূপে বড় ভগ্নীকে মার মত সম্মান করিবে এবং ছোট ভগ্নীকে মেয়ের মত আদর করিবে।

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক

চাচা, ফুফু, ভাতিজা, ভাতিজী ভাগিনা, ভাগ্নী, মামু, খালা ইত্যাদি যাহাদের সহিত জন্মগত ভাবেই আত্মীয়তা হয়, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তাহাদের খাওয়া-পরার কষ্ট হয়, তবে সঙ্গতি অনুসারে তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে। মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে হইবে। তাহাদের দ্বারা যদি কোন কষ্ট হয়, তবে তাহা সহ্য করিতে হইবে। আত্মীয়তা ছেদন করা যাইবে না।

শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, ভগ্নিপতি, জামাই, বৌ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান ইত্যাদি যাহাদের সহিত বিবাহের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাহাদেরও কিছু হক কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, তাহাদের সহিতও সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করা দরকার। তাহারা কোন কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করা দরকার। সাধ্যমত তাহাদের উপকার ও সাহায্য করা দরকার।

সাধারণ মুসলমানের হক

১। কোন মুসলমান কোন অন্যায় করিলে তাহা মাফ করিয়া দিবে। ২। কোন মুসলমানকে কাঁদিতে দেখিলে (বা কষ্টে দেখিলে) তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ৩। কোন মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করিবে না। ৪। কোন মুসলমান কোন ওজর পেশ করিলে বা মাফ চাহিলে তাহা গ্রহণ করিবে। ৫। কোন মুসলমানের কোন কষ্ট দেখিলে বা জানিতে পারিলে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। ৬। প্রত্যেক মুসলমানের খায়েরখাহী অর্থাৎ হিতকামনা করিবে। ৭। কোন মুসলমানের ভালবাসাকে উপেক্ষা করিবে না (এবং চিরজীবন তাহা নির্বাহ করিয়া চলিবে।) ৮। মুসলমানদের সহিত অঙ্গীকারের খেয়াল রাখিবে। ৯। কোন মুসলমান পীড়িত হইলে তাহার যত্ন নিবে। ১০। কোন মুসলমান মরিয়া গেলে (তাহার দাফন-কাফনে শরীক হইবে এবং) তাহার জন্য দো'আয়ে মাগফেরাত করিবে। ১১। কোন মুসলমান (ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিবে, কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিবে, আর্জু করিয়া, মহব্বত করিয়া) দাওয়াত করিলে তাহা গ্রহণ করিবে। ১২। কোন মুসলমান কোন তোহ্‌ফা হাদিয়া দিলে তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার মন সন্তুষ্ট করিয়া দিবে। ১৩। কোন মুসলমান সামান্য কোন উপকার করিলেও (তাহা সারা জীবন স্মরণ রাখিবে,) তাহার প্রত্যুপকারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিবে। ১৪। কোন মুসলমান সামান্য নেয়ামত দান করিলেও (তাহা অতি বড় মনে করিয়া) তাহার শোকর গুজারী করিবে। ১৫। কোন মুসলমানের কোন কাজে ঠেকা পড়িলে সকলে মিলিয়া সেই কাজ উদ্ধার করিয়া দিবে। ১৬। যে কোন মুসলমানের বিবি বাচ্চার হেফাযত করিবে। ১৭। যে কোন মুসলমানের কাজ করিয়া দিবে (তাহাতে লজ্জাবোধ করিবে না বা বখীলী করিবে না বা পর মনে করিবে না।) ১৮। যে কোন মুসলমান কোন কথা বলিতে চাহিলে (কিছু সময় দিয়া মনোযোগ দিয়া) তাহা শুনিবে। ১৯। কোন মুসলমান কোন সুপারিশ করিলে তাহা যথাসম্ভব গ্রহণ করিবে। ২০। কোন মুসলমান কোন আশা করিয়া আসিলে আশায় তাহাকে নিরাশ বা বঞ্চিত করিবে না। ২১। কোন

মুসলমান হাঁচি দিয়া 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌, বলিলে, "ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌" বলিয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র রহমতের দো'আ দিবে। ২২। কোন মুসলমানের হারান জিনিস পাইলে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে। ২৩। (কোন মুসলমানকে দেখিলে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিবে এবং) কেহ সালাম করিলে "ওআলাইকুমুস্‌সালাম" বলিয়া তাহার জওয়াব দিবে। ২৪। প্রত্যেক মুসলমানের সহিত নম্রভাবে হাসিমুখে মিষ্টি ভাষায় কথা বলিবে। ২৫। (কোন মুসলমানেরই কোন ক্ষতি বা অপকার করিবে না;) প্রত্যেক মুসলমানেরই উপকার করিবে (এবং করাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।) ২৬। কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ে ন্যায্য কসম খাইয়া বসে, তবে তাহা পূর্ণ ও রক্ষা করার জন্য সকলে চেষ্টা করিবে। ২৭। কোন মুসলমানের উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে তাহার সাহায্য করিবে এবং কোন মুসলমানকে অত্যাচার করিতে দেখিলে তাহাকে বাধা দিবে। ২৮। কোন মুসলমানের সহিত শত্রুতা করিবে না। প্রত্যেক মুসলমানকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিবে। ২৯। কোন মুসলমানকে লজ্জা দিবে না বা অপমান করিবে না। ৩০। নিজে যেইরূপ ব্যবহার পাইতে ভালবাস, প্রত্যেক মুসলমানের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবে। ৩১। পুরুষের সহিত পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইলে একে অন্যকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিবে এবং হাতে হাতে ধরিয়া মুছাফাহা করিয়া দেল মিশাইয়া রাখিবে। ৩২। যদি কোন কারণবশতঃ মুসলমানে মুসলমানে কিছু দ্বন্দ্ব-কলহ হইয়া যায়, তবে তিন দিনের বেশী তাহা মনে রাখিবে না, তিন দিনের মধ্যে তাহা আপোষ-মীমাংসা করিয়া ফেলিয়া রীতিমত সালাম কালাম করিবে। ৩৩। কোন মুসলমানের উপর বদগোমানী অর্থাৎ কু-ধারণা পোষণ করিবে না। ৩৪। মুসলমানের সহিত হিংসা-বিদ্বেষ করিবে না এবং কোন মুসলমানের সহিত মনোমালিন্য রাখিবে না। ৩৫। প্রত্যক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানকে সৎ-কাজে আদেশ এবং বদ-কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকিবে। ৩৬। প্রত্যেক মুসলমানই বড়কে আদব এবং ছোটকে স্নেহ করিবে। ৩৭। দুইজন মুসলমানের মধ্যে কোন ঝগড়া-কলহ হইয়া পড়িলে প্রত্যেক মুসলমানের তাহা মিটাইয়া দেওয়া ওয়াজেব। ৩৮। কোন মুসলমানেরই অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা গীবত করিবে না। ৩৯। কোন মুসলমানেরই কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি বা সম্মানের লাঘবজনক কোন কাজ করিবে না। ৪০। (মজলিসের মধ্যে) কোন মুসলমানকে তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় বসিবে না।

প্রতিবেশীর হক

১। প্রতিবেশীর উপকার করিবে। প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিবে না। (প্রতিবেশীর দ্বারা বা তাহার গরু-বাছুর ছাগল মুরগী বা ছেলে-মেয়ের দ্বারা যদি কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হয়, তবে সে কারণে তাহার সহিত ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করিবে না, ছবর করিবে।)

২। প্রতিবেশীর বিবি-বাচ্চার, (গরু-বাছুর) ইত্যাদির হেফাযত করিবে। (তাহার অনুপস্থিতিতে বা তাহার অপারগ অবস্থায় লাকড়ি, পানি, বাজার সদায় ইত্যাদি কাজে তাহার সহায়তা করিবে। প্রতিবেশী গরীব হইলে তাহাকে বা তাহার ছেলে-মেয়েদের দেখাইয়া তাহাদের না দিয়া তুমি ভাল ভাল জিনিস খাইবে না বা ব্যবহার করিবে না।)

৩। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর বাড়ীতে তোহ্‌ফা হাদিয়া পাঠাইবে; তোমার ঘরে যাহাকিছু খাবার তৈয়ার হয়, তাহা হইতে কিছু তাহাদের দিবে। বিশেষতঃ প্রতিবেশী যদি গরীব হয় এবং খাওয়া পরার কষ্ট থাকে, তবে অবশ্য তাহাকে খাবার দিয়া তাহার সাহায্য করিবে।

৪। প্রতিবেশীকে কিছুতেই কোনরূপ কষ্ট দিবে না।

জানিয়া রাখিবে, প্রতিবেশী যেরূপ শহরের বা গ্রামের বাড়িতে হয়, তদ্রূপ সফরে এবং বিদেশেও হয়। বাড়ি হইতে যাহার সহিত একত্রে সফরে যায় বা বিদেশে গিয়া এক সঙ্গে সফর করে (বা স্কুলে বা মাদ্রাসায় বা অফিসে থাকে) এই সবই প্রতিবেশী। প্রতিবেশী সম্বন্ধে মোটামুটি এতটুকু খেয়াল রাখা দরকার যে, (নিজের কষ্টের চেয়ে তাহার কষ্টকে বড় মনে করিবে) নিজের আরামের চেয়ে তাহার আরামের জন্য বেশী চেষ্টা করিবে। কোন কোন নির্বোধ লোক গাড়ীর বা জাহাজের সহযাত্রীদের সহিত অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, ইহা বড়ই জঘন্য।

নিরাশ্রয়ের হক

১। যাহারা এতীম, বিধবা, অন্ধ, চিররোগা, আতুর, কর্মশক্তিহীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, মুসাফের, তাহাদের দয়া করা এবং তাহাদের সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

২। টাকা-পয়সা বা খাওয়া-পরার জিনিস দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৩। তাহাদের বাড়ীর কাজ নিজ হাতে করিয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৪। কথার দ্বারা সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৫। এইরূপ হতভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করিয়া তাহাদের আবদার রদ না করিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিবে।

অমুসলমানের হক

১। (হিন্দু-খ্রীষ্টান প্রভৃতি অমুসলমানগণ মুসলমান না হইলেও তাহারা মানুষ। কাজেই মানুষ হওয়ার কারণে তাহাদেরও হক আছে।।) তাহাদের হক এই যে, অন্যায়ভাবে কাহারও জানে কষ্ট দিবে না বা কাহারও মালের কোন ক্ষতি করিবে না।

২। অন্যায়ভাবে কাহাকেও মন্দ বলিবে না বা গালি দিবে না বা কাহারও সহিত খামাখা ঝগড়া করিবে না।

৩। কাহাকেও খাওয়া-পরার অভাবে বা রোগের যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে বা বিপদগ্রস্ত দেখিলে বা আগুনে পুড়িতে বা পানিতে ডুবিতে দেখিলে তাহার জান-মাল বাঁচাইয়া দিবে, কষ্ট দূর করিয়া দিবে।

৪। শরীঅতের আইন অনুসারে কেহ শাস্তির উপযুক্ত হইলে ন্যায্য বিচার এবং ন্যায্য শাস্তি দিবে, অন্যায়ভাবে বিচার করিবে না বা শাস্তি দিবে না।

পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদির হক

১। (পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদি মানুষেরই উপকারার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে; কিন্তু অযথা কাহাকেও কষ্ট দেওয়ার কাহারও অধিকার নাই। কাজেই,) যে-সব পক্ষী বা পশুর দ্বারা মানুষের

কোন কাজ হয় না, উহাদের অনর্থক আবদ্ধ করিয়া রাখা চাই না। বিশেষতঃ বাসা হইতে শাবকদের নিয়া আসা এবং উহাদের মা-বাপকে এইরূপে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা।

২। যে-সমস্ত পশু বা পক্ষী খাওয়ার উপযুক্ত নহে তাহাদের শুধু মনের আনন্দের জন্য বধ করিবে না।

৩। গৃহপালিত পশুপক্ষীদের খাওয়া-পিয়া এবং থাকার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে, তাহাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, আরামে থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার এবং যেসব পশুর দ্বারা কাজ নেওয়া হয় তাহাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ তাহাদের দ্বারা নিবে না এবং নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের প্রহার করিবে না।

৪। যেসমস্ত জানওয়ার খাওয়ার জন্য যবাহ করা হয় বা মানুষের কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে বধ করিয়া ফেলা হয় তাহাদেরও ধারাল অস্ত্র দ্বারা অতি শীঘ্র কাজ শেষ করিয়া দিবে। ক্ষুধার কষ্ট দিয়া বা ভোঁতা ছুরি দ্বারা কষ্ট দিবে না।

একটি জরুরী বিষয়

যদি কাহারও হক আদায় করার মধ্যে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে (সে হক কি প্রকার।) যদি পরিশোধ করার উপযুক্ত হক হয় (যেমন কাহারও নিকট হইতে কোন মাল ধার আনিয়া তাহা দেয় নাই বা করয আনিয়া তাহা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই বা বাকী সদায় আনিয়া দোকানদারের পয়সা দেয় নাই বা সুদ ঘুষ খাইয়াছে বা চুরি ডাকাতি করিয়াছে বা আমানত খেয়ানত করিয়াছে, যদি এই প্রকারের হক হয়,) তবে পরিশোধ করিয়া দিবে অথবা মাফ চাহিয়া লইবে। আর যদি পরিশোধ করার উপযুক্ত হক না হয় (যেমন কাহারও গীবত করিয়াছে বা কাহাকেও গালি দিয়াছে বা কাহাকেও অনর্থক মারিয়াছে) তবে শুধু মাফ চাহিয়া লইবে। আর যদি কোন কারণবশতঃ (হয়ত নিজের কাছে টাকা না থাকার দরুন বা হকদারের কোন ঠিকানা না পাওয়ার দরুন) হকদারের দেনা পরিশোধও করিতে পারে না এবং তাহাদের থেকে মাফও লইতে পারে না, তবে জীবন ভরিয়া হামেশা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আয়ে মাগফেরাত করিতে থাকিবে। হয়ত এইরূপে চিরজীবন কান্না-কাটার ফলে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে রাযী করিয়া তাহাদের থেকে মাফ লইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদি পরে আবার কোন সময় মাফ লওয়ার বা পরিশোধ করার সুযোগ হয়, তবে অবহেলা করিলে চলিবে না, মাফ চাহিয়া লইবে অথবা পরিশোধ করিয়া দিবে। (এইসব হকুকুল এবাদের ব্যাপার বড়ই কঠিন বিষয়। এসম্বন্ধে কিছুতেই অবহেলা করিবে না।)

আর তোমার যেসব হক (পাওনা) অন্যের কাছে রহিয়া গিয়াছে তাহা যদি উসুল হওয়ার আশা থাকে, তবে নরমির সহিত উসুল করিয়া লইবে; আর যদি উসুল হওয়ার আশা না থাকে বা হকই এমন হয় যে, তাহা উসুল হওয়ার উপযুক্ত নহে (যেমন গীবত, গালি ইত্যাদি) তবে যদিও ঐ সব হকের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন নেকী পাওয়ার আশা আছে তবুও মাফ করিয়া দেওয়াতে আরও অধিক নেকী পাওয়ার আশা আছে; কাজেই একেবারেই মাফ করিয়া দিলে অধিক নেকী পাওয়ার আশা। তাই একেবারেই মাফ করিয়া দেওয়াই অধিক উত্তম। বিশেষতঃ যদি কেহ মাফ চায় বা খোশামোদ করে, তবে ত অবশ্যই মাফ করিয়া দেওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট (জমীমা)

যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম

১৭। মাসআলা ঃ কোন পুরুষ অপর এক স্ত্রীর সহিত যিনা করিল। এখন ঐ স্ত্রীলোকের মা, ঐ স্ত্রীলোকের মেয়ে (বা মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ নিম্নদিকে কোন মেয়ের সহিত (ই) ঐ পুরুষের বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

১৮। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক কামভাবের সহিত বদ নিয়্যতে অপর কোন পুরুষের শরীর স্পর্শ করিল। এখন এই স্ত্রীলোকের মা এবং তাহার সন্তানের সহিত ঐ পুরুষের বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। এইরূপে যদি কোন পুরুষ কামভাবসহ অপর কোন স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করিল, এখন ঐ পুরুষ, তাহার মা এবং সন্তানগণ ঐ স্ত্রীলোকের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

১৯। মাসআলা ঃ রাত্রে নিজের স্ত্রীকে জাগাইবার জন্য উঠিল। কিন্তু ভুলে তাহার কন্যার বা শাশুড়ীর গায়ে হাত এবং নিজ স্ত্রী মনে করিয়া কামভাবের সহিত তাহার গায়ে হাত দিল। এমতাবস্থায় এই পুরুষ তাহার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হইয়া গেল। কোন প্রকারেই তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই পুরুষের তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতেই হইবে।

২০। মাসআলা ঃ কোন ছেলে কুমতলবে তাহার বিমাতার শরীরে হাত লাগাইল। এখন ঐ ছেলের পিতার জন্য ঐ স্ত্রীলোক একেবারেই হারাম হইয়া গেল। কোন প্রকারে তাহার জন্য হালাল হইবে না। আর যদি বিমাতাও তাহার বিপুত্রের শরীরে কুমতলবে হাত লাগায়, তবেও ঐ একই হুকুম। অর্থাৎ স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হইয়া যাইবে।

২১। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী নাই। কিন্তু বদকারীতে হামল (গর্ভবতী) হইল। এই স্ত্রীলোকের বিবাহ দুরুস্ত আছে। কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বামী-সহবাস দুরুস্ত নহে। অবশ্য যে ব্যক্তি যিনা করিয়াছে তাহার সহিত বিবাহ হইলে সহবাস দুরুস্ত হইবে।

জরূরী মাসআলা

তালাক দেওয়া অতি জঘন্য কাজ। একান্ত জরুরতবশতঃ অপারগ অবস্থায় যদি তালাক দিতে হয়, তবে নিম্নোক্ত তরীকা (নিয়ম) অবলম্বন করিবে। তালাকের তিনটি তরীকা আছে। ১। অতি উত্তম, ২। বেদ'আত এবং ৩। হারাম।

১। তালাকে অতি উত্তম তরীকা—স্ত্রী যখন হায়েয হইতে পাক হইবে, তখন (দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পাকীর সময়কে ত্বহুর বলে) অর্থাৎ ত্বহুরের সময় এক তালাক দিবে। কিন্তু শর্ত হইল, যে ত্বহুরে তালাক দিবে ঐ পূর্ণ ত্বহুরের মধ্যে তাহার সহিত সহবাস হইতে বিরত থাকিবে। ইদ্দতের সময় কোন তালাক দিবে না; ঐ তালাকের ইদ্দত অতীত হইলে বিবাহ টুটিয়া যাইবে। বেশী তালাকের দরকার নাই। কারণ শরীঅতে একান্ত প্রয়োজনের সময়ে তালাকের অনুমতি আছে। সুতরাং প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক তালাকের কি দরকার থাকিতে পারে?

২। উত্তম তরীকা—স্ত্রী হায়েয হইতে পাক হইলে তিন ত্বহুরে তিন তালাক দিবে। ঐ সময় ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না।

৩। তালাকের বেদ'আত এবং হারাম তরীকা—ইহা হইল উপরোক্ত তরীকার বিপরীত নিয়মে তালাক দেওয়া। যেমন, এক সঙ্গেই তিন তালাক দেওয়া, অথবা হায়েযের সময় তালাক দেওয়া, বা যে ত্বহুরে সহবাস করিয়াছে ঐ ত্বহুরে তালাক দেওয়া। শেষোক্ত তরীকার যে কোন অবস্থায় তালাক দিলে তালাক নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হইয়া যাইবে; কিন্তু গোনাহ্ হইবে। শরীঅতের এই মাসআলাটি বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ও পালনীয়। উপরে যে হায়েযের সময় তালাক দেওয়া অবৈধ বলা হইয়াছে উহা ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে যাহার সহিত সহবাস বা নির্জন-মিলন হইয়াছে। যদি স্বামী-সহবাস বা নির্জন-মিলন না হইয়া থাকে হায়েযের সময়েই হউক বা পাকীর সময়েই হউক উভয় অবস্থায়ই তালাক দেওয়া দুরুস্ত হইবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় এক তালাক দিবে। তিন তালাক দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।

ওলীর বয়ান

১০। মাসআলা ঃ (বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর) কন্যা জবান দ্বারা স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে নাই। কিন্তু বর যখন সহবাস করিতে আসিয়াছে তখন সে অস্বীকার করে নাই, এরূপ অবস্থায় হইলেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে।

১৫। মাসআলা ঃ পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কেহ (ভাই বা চাচা) বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের কথা মেয়ের জানা ছিল, পরে বালেগা হইল (স্বামী এখনও তাহার সহিত সহবাস করে নাই। কিন্তু যেইমাত্র বালেগা হইল তন্মুহূর্তেই সে বিবাহের কথা অস্বীকার করিয়া বলিল, 'আমি এই বিবাহে রাযী নাই' অথবা বলিল, 'আমি এই বিবাহ বাকী রাখিতে চাই না'। তথায় আর কেহ চাই উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, চাই একাই বসা থাকুক তবুও বিবাহ ভঙ্গ করাইতে হইলে ঐ কথা আওয়ায করিয়া বলিতেই হইবে যে, 'আমি এই বিবাহে রাযী নহি' কিন্তু শুধু এতটুকু বলাতেই বিবাহ ভঙ্গ হইবে না। শরয়ী হাকিমের নিকট যাইতে হইবে, তিনি যদি বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দেন, তবে বিবাহ ভঙ্গ হইবে, অন্যথায় বিবাহ বিচ্ছেদ হইবে না। বালেগা হওয়ার পর এক মুহূর্তও যদি চুপ থাকে, তবে আর বিবাহ ভঙ্গ করাইবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যদি বিবাহের কথা মেয়ের জানা না থাকে, বালেগা হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছে, তবে যে মুহূর্তে জানিতে পারিয়াছে সেই মুহূর্তেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হইবে। তখন এক মুহূর্তও যদি চুপ থাকে, তবে বিবাহ ভঙ্গ করাইবার অধিকার থাকিবে না। (এই হুকুম হইল মেয়ের বেলায়। ছেলে বালেগ হইলে তৎমুহূর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা জরুরী নহে; বরং তাহার রেযামন্দী বা সম্মতি কার্যে বা কথায় প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কবূল করা না করার অধিকার বজায় থাকিবে।

১৬। মাসআলা ঃ স্বামী সহবাস করার পর মেয়ে বালেগা হইল। এই অবস্থায় যদি বিবাহ ভঙ্গ করিতে চায়, তবে বালেগা হওয়া মাত্র কিংবা বিবাহের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া মাত্রই এন্‌কার করা জরুরী নহে; বরং যে পর্যন্ত তাহার রেযামন্দীর (সম্মতির) অবস্থা জানা না যাইবে, সে পর্যন্ত কবূল করা না করার অধিকার বাকী থাকিবে—যত সময়ই অতীত হউক না কেন। অবশ্য সে যখন মুখে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিল যে, অমি মঞ্জুর করিলাম অথবা অনুরূপ কোন কথা প্রকাশ পাইল

যাহাতে রেযামন্দী ছাবেত হয়। যেমন, নির্জনে স্বামীর সহিত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় রহিল তবে আর বিবাহ ভঙ্গের অধিকার থাকিবে না। বিবাহ লাযেম হইয়া যাইবে।

মহর

মাসআলা ঃ নিজ অবস্থানুযায়ী ১০·০০, ২০·০০, ১০০·০০, বা হাজার টাকা। মহর ধার্য করিয়া বিবিকে নিজের বাড়ীতে নিয়া আসিল এবং তাহার সহিত সহবাস করিল কিংবা সহবাস করে নাই বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এমন নির্জন স্থানে অবস্থান করিল যেখানে সহবাসের কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল না, এখন নির্ধারিত পূর্ণ মহর দিতে হইবে। অথবা এরূপ কোন অবস্থা হয় নাই, অথচ স্বামী বা স্ত্রী মারা গেল, তবুও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। আর যদি উক্তরূপ কোন অবস্থা না হইয়া স্বামী তালাক দিয়া থাকে, তবে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিতে হইবে। মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি উক্তমত নির্জন-মিলন হইয়া থাকে অথবা উভয়ের মধ্যে কেহ মারা যায়, তবে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। আর যদি উপরোক্ত মতে নির্জন-মিলন হওয়ার পূর্বে তালাক হইয়া যায়, তবে অর্ধেক মহর ওয়াজেব হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোন একজন অসুস্থ ছিল অথবা রমযানের রোযা রাখিয়াছিল অথবা হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিয়াছিল অথবা স্ত্রী হায়েয ছিল অথবা তথায় কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, এসকল অবস্থায় যদি তাহাদের নির্জন-মিলন হইয়া থাকে, তবে তাহা নির্জন-মিলন বলিয়া ধরা হইবে না। ইহাতে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে না। এমতাবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয়, তবে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাইবার অধিকারিণী হইবে। রমযানের রোযা রাখে নাই, নফল বা ক্বাযা রোযা বা মান্নতের রোযা রাখিয়াছে এবং নির্জন-মিলন হইয়াছে, এমতাবস্থায় স্ত্রী পুরা মহরের হকদার হইবে এবং স্বামী পুরা মহর দিতে বাধ্য হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** স্বামী 'না-মরদ', এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নির্জন-মিলন হইয়াছে, এরূপ হইলে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। এইরূপ নপুংসক বিবাহ করিয়া নির্জন-মিলনের পর তালাক দিয়াছে, তবুও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী নির্জনে রহিল; কিন্তু স্ত্রী এত ছোট যে, সহবাসের যোগ্য নহে, কিংবা স্বামী খুব ছোট, সহবাসে সক্ষম নহে, এরূপ অবস্থায় নির্জন-মিলন হইলেও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে না।

১৫। **মাসআলা ঃ** কেহ বে-কায়দা বিবাহ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, গোপন বিবাহ করিয়াছে, যথারীতি দুইজন সাক্ষী সম্মুখে ছিল না অথবা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা বধির ছিল, বিবাহ বন্ধনের শব্দগুলি শুনিতে পায় নাই, কিংবা পূর্ব স্বামী তালাক দিয়াছিল, অথবা মারা গিয়াছিল এখনও ইদ্দত পূর্ণ হয় নাই, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে। এইরূপ কোন (শরীঅত বিরোধী) বেকায়দা কাজ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু স্বামী এখনও সঙ্গম করে নাই, তবে কোন মহর পাইবে না। যদি সঙ্গম করিয়া থাকে, তবে মহরে মেছেল দিতে হইবে। কিন্তু যদি বিবাহকালে কোন মহর নির্ধারিত করিয়া থাকে, মহরে মেছেল তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে ঐ নির্ধারিত মহরই পাইবে, মহরে মেছেল পাইবে না।

১৬। মাসআলা ঃ কেহ আপন স্ত্রী মনে করিয়া ভুলে অন্য স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিল তাহাকেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। এই সঙ্গমকে যেনা বলা যাইবে না এবং ইহাতে গোনাহ্‌ও হইবে না। ইহাতে যদি গর্ভ হয়, তবে তাহার নছব ঠিক থাকিবে। নছবে কোন দোষ বা কলঙ্ক হইবে না, উহাকে হারামী বলা দুরুস্ত হইবে না। যখন জানা যাইবে যে, সে তাহার স্ত্রী নহে, তখন তাহাকে ঐ স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে, পুনরায় সঙ্গম করা দুরুস্ত হইবে না। ঐ স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব হইবে। ইদ্দত পুরা করা ব্যতীত নিজ স্বামীর সহিত অবস্থান করা এবং স্বামীরও তাহার সহিত সঙ্গম করা দুরুস্ত হইবে না। ইদ্দতের বিধান পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭। মাসআলা ঃ যে পরিমাণ মহর অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম আছে, সেই পরিমাণ মহর পূর্বে দেয় নাই। এমতাবস্থায় স্বামীকে সহবাস করিতে না দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর আছে। একবার সঙ্গম করিয়া থাকিলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারও সহবাস হইতে বঞ্চিত রাখার অধিকার স্ত্রীর থাকিবে। স্বামী বিদেশে সফরে নিতে চাহিলে ঐ মহর আদায় না করিয়া নিতে পারিবে না। আর যদি এমতাবস্থায় স্ত্রী নিজের কোন প্রিয় মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সহিত বিদেশে যায় বা নিজের পিত্রালয়ে চলিয়া যায়, তবে স্বামী তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। ঐ নির্ধারিত মহর পরিশোধ করিয়া দিলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঐসব কিছুই করিতে পারিবে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও আসা-যাওয়া করা জায়েয হইবে না। স্বামী যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিবে তাহাতে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

কাফেরের বিবাহ

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রী মুসলমান হইয়া গেল, স্বামী মুসলমান হইল না। (এখন বিবাহ রহিল না, কিন্তু) এই স্ত্রী পূর্ণ তিন হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না।

স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

৪। মাসআলা ঃ রাত্রে সকল স্ত্রীর ঘরে সমভাবে থাকা ত ওয়াজেব; কিন্তু সকল স্ত্রীর সহিত সমপরিমাণ সঙ্গম করা ওয়াজেব নহে। একজনের পালায় সঙ্গম করিলে অন্য জনের পালায়ও জরুরী নহে।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে তালাক

স্বামী-স্ত্রী যদি নির্জনে মিলিত হইয়া থাকে, সঙ্গম হউক বা না হউক এখন স্ত্রীকে পরিষ্কার শব্দে তালাক দিলে তালাকে রজয়ী হইবে, পুনঃ বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীকে রাখিবার এখ্‌তিয়ার স্বামীর থাকিবে। একাধিক অর্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে বায়েন তালাক পড়িবে; (পুনর্বিবাহ ব্যতিরেকে স্বামী তাহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না।) কিন্তু স্ত্রীর ইদ্দত পালন করিতে হইবে, ইদ্দত পুরা হইবার পূর্বে অন্যের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। এই ইদ্দতের মধ্যে তাহার স্বামী ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালাক দিতে পারে।

তিন তালাকের মাসআলা

১। **মাসআলা ঃ** (তিন তালাকের পর) যদি পুনরায় ঐ পুরুষের সহিত থাকিতে চায় এবং বিবাহে আবদ্ধ হইতে চায়, তবে উহার একটি মাত্র ছুরত (উপায়) আছে। তাহা এই—প্রথমে অন্য কোন পুরুষের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইবে এবং সহবাসও করিবে। যখন এই স্বামী মরিয়া যায় বা স্বইচ্ছায় তালাক দিয়া দেয়, তখন ইদ্দত পুরা করার পর প্রথম স্বামীর নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে। অন্য স্বামী গ্রহণ ব্যতীত প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল, এখনও স্ত্রী-সহবাস হয় নাই কিন্তু স্বামী মারা গেল অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়া দিল, এই বিবাহ ধর্তব্য নহে। প্রথম স্বামীর সহিত ঐ সময় বিবাহ হইতে পারিবে যখন দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাসও হইবে। দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাস ব্যতীত প্রথম স্বামী পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(প্রকাশ থাকে যে, অনেক দুষ্ট লোক পরামর্শ করিয়া 'এক দুই রাত রাখিয়া তালাক দিয়া দিবেন' এই শর্ত করিয়া দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ দেয় এবং উহাকে হিলাশরা বলে, ইহা অতি জঘন্য পাপ। হাদীস শরীফে আছে, এইরূপ যে করিবে এবং যাহার কথায় বা পরামর্শে করিবে উভয়ের উপর লা'নত।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি দ্বিতীয় স্বামীর সহিত এই শর্তে বিবাহ হইয়া থাকে যে, সহবাসের পর স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবে। এরূপ এক্‌রার লওয়া ধর্তব্য নহে। তাহার ইচ্ছা, ছাড়িয়াও দিতে পারে, নাও দিতে পারে। এরূপ এক্‌রার করিয়া বিবাহ করা হারাম। ইহাতে বড় গোনাহ হয়। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে লা'নত পতিত হয়; কিন্তু বিবাহ হইয়া যায়, দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দেউক বা মারা যাউক, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে।

শর্তের উপর তালাক

১। **মাসআলা ঃ** কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, যদি তোমার হায়েয আসে, তবে তোমাকে তালাক। ইহার পর তাহার রক্ত দেখা দিল, তখনই তাহার উপর তালাকের হুকুম বর্তিবে না; বরং পূর্ণ তিন দিন তিন রাত রক্ত আসিলে এই তিন দিন তিন রাত্রির পর যে সময় হইতে রক্ত আসিয়াছিল, সেই সময় তালাক বর্তিবে।

আর যদি একথা বলিয়া থাকে যে, যখন তোমার এক হায়েয আসিবে, তখন তোমাকে তালাক। এই অবস্থায় যখন হায়েয শেষ হইবে, তখন তালাক পতিত হইবে।

রজআতের বয়ান

২। **মাসআলা ঃ** (রজয়ী তালাক দেওয়ার পর) রজআতের এক তরীকা ইহাও যে, মুখে ত কিছুই বলে নাই, কিন্তু তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, অথবা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে বা পেয়ার করিয়াছে বা কামভাবের সহিত তাহার শরীরে হাত লাগাইয়াছে, এসমস্ত অবস্থায় সে স্ত্রী হইয়া যাইবে, পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** যে নারীর হায়েয আসে তাহার তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয। তিন হায়েয পুরা হইয়া গেলে ইদ্দত পুরা হইয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লও যে, তৃতীয় হায়েয পুরা দশ দিন আসিল, তখন যে সময় রক্ত বন্ধ হইল এবং দশ দিন পূর্ণ হইল, ঐ সময়েই তাহার ইদ্দত শেষ হইল। রজয়ী তালাকের পর ফিরাইয়া লওয়ার যে অধিকার পুরুষের ছিল তাহা আর কোনদিন থাকিবে না, স্ত্রী গোসল করুক বা না করুক ইহা ধর্তব্য নহে। যদি তৃতীয় হায়েয দশ দিনের কম আসিয়া রক্তও বন্ধ হইল, আওরত এখনও গোসল করে নাই এবং তাহার উপর কোন নামাযও ওয়াজেব হইল না, তবে এখনও পুরুষের এখ্‌তিয়ার থাকিবে, এখনও যদি স্বেচ্ছায় মত ফিরাইয়া লয়, তবে সে নারী তাহার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার পর নারী গোসল করিল, অথবা গোসল করে নাই বটে, কিন্তু এক নামাযের সময় অতীত হইয়া গেল, অর্থাৎ এক নামাযের ক্বাযা তাহার উপর ওয়াজেব হইল, এই উভয় অবস্থাতেই পুরুষের এখ্‌তিয়ার থাকিবে না। এখন বিবাহ ব্যতীত আর তাহাকে রাখা যাইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীর সহিত এখনও সহবাস করে নাই যদিও নির্জন মিলন হইয়া থাকে, তাহাকে এক তালাক দিয়া ফিরাইয়া রাখার এখতিয়ার থাকে না। কেননা, তালাক দিলে বায়েন তালাক বলিয়া গণ্য করা হইবে। এসম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবে।

৭। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একস্থানে নির্জনে রহিল। কিন্তু পুরুষ বলে, আমি সহবাস করি নাই। এমতাবস্থায় তালাক দিয়া দিল, এখন আর তালাক হইতে রজ'আত করার এখতিয়ার রহিল না।

স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম

১। **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল খোদার কসম, এখন আর সহবাস করিব না; খোদার কসম, তোর সহিত কখনও সহবাস করিব না; কসম খাইতেছি যে, তোমার সহিত ছোহ্‌বত করিব না, অথবা অন্য কোন প্রকারে বলিল, এ সমস্ত অবস্থায় হুকুম হইল এই—যদি সহবাস না করিয়া থাকা অবস্থায় চারি মাস অতীত হইয়া যায়, তবে স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পড়িবে। এখন পুনঃ বিবাহ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সহবাস করিতে পারিবে না। যদি চারি মাসের ভিতর কসম ভঙ্গ করে এবং সহবাস করে, তবে তালাক হইবে না, অবশ্য কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে। এইরূপ কসমকে শরীঅতের ভাষায় "ঈলা" বলে।

২ **মাসআলা ঃ** হামেশার জন্য সহবাস না করার কসম খাইল না; বরং শুধু চারি মাসের জন্য কসম খাইল, যেমন বলিল, খোদার কসম চারি মাস কাল তোমার সহিত সহবাস করিব না, ইহাতে ঈলা হইয়া যাইবে। ইহারও বিধান এই যে, ৪ মাস সহবাস না করিলে বায়েন তালাক পতিত হইবে। ৪ মাসের পূর্বে সহবাস করিলে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

৩। মাসআলা ঃ চারি মাস হইতে কম সময়ের কসম খাইলে তাহাতে ঈলা হইবে না। এমন কি, চারি মাসের একদিন কমের কসম খাইলেও ঈলা হইবে না। অবশ্য যত দিনের কসম খাইবে, ততদিনের পূর্বে সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। সহবাস না করিলে তালাক বর্তিবে না, কসমও পুরা থাকিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কেহ শুধু চারি মাসের জন্য কসম খাইল, কসম ভাঙ্গিল না, চারি মাসের পর তালাক বর্তিল। তালাকের পর ঐ পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইল। এখন চারি মাস পর্যন্ত সহবাস না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

হামেশার জন্য কসম খাইল, যেমন বলিল, 'কসম খাইতেছি যে, এখন হইতে আর তোমার সহিত সহবাস করিব না'। অথবা বলিল, 'খোদার কসম, তোমার সহিত কখনও সহবাস করিব না'। সে কসম ভঙ্গ করিল না। চারি মাস পর তালাক হইয়া যাইবে। ইহার পর তাহাকে বিবাহ করিল, বিবাহের পর চারি মাস পর্যন্ত সহবাস করিল না, এখন পুনরায় তালাক হইয়া যাইবে। তৃতীয় বার তাহাকেই বিবাহ করিল, তাহারও হুকুম এই যে, এই বিবাহের পর যদি চারি মাস সহবাস না করে, তবে তৃতীয় তালাক পতিত হইবে। এখন অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ইহার সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। অবশ্য যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহের পর সহবাস করিত, তবে কসম ভঙ্গ হইত। তাহা হইলে আর কখনও তালাক পড়িত না, অবশ্য কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইত।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপে আগে পিছে তিন বিবাহেই তিন তালাক পড়িয়া গেল। ইহার পর স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিল, এখন এই স্বামী তালাক দিল। এমতাবস্থায় ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ হইল, সে সহবাস করিল না। এখন তালাক পড়িবে না, যত দিনই সহবাস না করুক না কেন। কিন্তু যখনই সহবাস করিবে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে। কারণ, সে যে কসম খাইয়াছিল "কখনও তাহার সহিত সহবাস করিবে না" সে কসম ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়ার পর যদি তাহার সহিত সহবাস করার কসম খায়, তবে ঈলা হইবে না। এখন যদি পুনরায় বিবাহের পর সহবাস না করে তবে তালাক বর্তিবে না। কিন্তু সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে। যদি রজয়ী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের ভিতর এইরূপ কসম খায়, তবে ঈলা হইবে। যদি রজ'আত করে এবং সহবাস না করে, তবে চারি মাস পর তালাক বর্তিবে। যদি সহবাস করে, তবে কসমের কাফ্ফারা দিবে।

৭। **মাসআলা ঃ** খোদার কসম খায় নাই; বরং বলিল, 'যদি তোমার সহিত সহবাস করি, তবে তুমি তালাক। ইহাতেও ঈলা হইয়া যাইবে। সহবাস করিলে রজয়ী তালাক হইবে, কসমের কাফ্ফারা দিতে হইবে না। সহবাস না করিলে চারি মাস পর বায়েন তালাক হইবে।

আর যদি বলে, 'তোমার সহিত সহবাস করিলে আমার উপর এক হজ্জ অথবা এক রোযা, এক টাকা খয়রাত অথবা এক কোরবানী,' এই সকল ছুরতেও ঈলা হইবে। যদি সহবাস করে, তবে যে কথা বলিয়াছে উহা করিতে হইবে, কাফ্ফারা দিতে হইবে না। যদি চারি মাস সহবাস না করে, তবে তালাক হইবে।

বিবিকে মাতার সমতুল্য বলা

[ঈলা ও যেহারের বয়ান দ্রষ্টব্য]

১। **মাসআলা ঃ** কেহ আপন স্ত্রীকে বলিল, "তুমি আমার মায়ের সমতুল্য অথবা বলিল, 'তুমি আমার জন্য মায়ের সমতুল্য, তুমি আমার হিসাবে মার তুল্য, এখন তুমি আমার নিকট মাতার ন্যায় বা মাতার মত'। এই সকল অবস্থায় দেখিতে হইবে, তাহার মতলব কি। যদি এই মতলব

হয় যে, তা'যীম ও বুযুর্গীতে মায়ের বরাবর অথবা এই মতলব হয় যে, তুই একেবারে বুড়ি, বয়সে আমার মায়ের সমান, তাহা হইলে এরূপ বলায় যেহার হইবে না। আর যদি বলার সময় কোন নিয়্যত না থাকে এবং কোন মতলব না থাকে, এমনি বলিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেও যেহার হইবে না। যদি তালাক বা ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত থাকিয়া থাকে, তবে এক তালাক বায়েন হইবে; যদি তালাক দিবারও নিয়ত না থাকিয়া থাকে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবারও নিয়্যত ছিল না; বরং মতলব শুধু এই যে, যদিও তুমি আমার স্ত্রী, তোমা হইতে বিবাহ ছিন্ন করিতেছি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে কখনও সহবাস করিব না, তোমার সহিত সহবাস করা আমার উপর হারাম করিয়া লইলাম। ভরণ-পোষণ নিয়া পড়িয়া থাক। মোটকথা, তাহাকে ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত ছিল না, সহবাস করাকে হারাম করিয়া লইয়াছে। ইহাকে শরীঅতের বিধানে 'যেহার' বলে। ইহার হুকুম হইল এই—সে স্ত্রী স্ত্রীই থাকিবে, কিন্তু স্বামী কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করা, কামভাবের সহিত তাহাকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, পেয়ার করা ইত্যাদি হারাম থাকিবে। এই অবস্থায় যত বৎসরই অতীত হউক না কেন কাফ্‌ফারা আদায় করিলে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় থাকিতে পারিবে, পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইহার কাফ্‌ফারা রোযা ভঙ্গে কাফ্‌ফারার ন্যায় দিতে হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** কাফ্‌ফারা দিবার পূর্বেই যদি সহবাস করে, তবে বড় গোনাহ্ হইবে। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোনাহ্ মাফের জন্য তওবা এস্তেগফার করিবে। আর দৃঢ় সংকল্প করিবে যে, কাফ্‌ফারা না দিয়া আর কখনও সহবাস করিবে না। কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীও স্বামীকে তাহার নিকট ঘেঁষিতে দিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি ভগ্নী, মেয়ে, ফুফু অথবা এমন এক স্ত্রীলোকের সহিত তুলনা করে যাহার সহিত চিরকাল বিবাহ হারাম, তবে তাহারও এই একই হুকুম।

৪। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, তুই আমার জন্য শূকর সদৃশ, তবে যদি তালাক বা ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত থাকিয়া থাকে, তবে ত তালাক হইবেই। আর যদি যেহারের নিয়্যত করিয়া থাকে অর্থাৎ মতলব ছিল যে, তালাক ত দিতাম না; বরং সহবাস করা নিজের উপর হারাম করা, তবে কিছুই হয় নাই, তদ্রূপ যদি কোন নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবেও কিছু হয় নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি যেহারে চারি মাস কিংবা তদপেক্ষা অধিককাল স্ত্রী-সহবাস না করিয়া থাকে এবং কাফ্‌ফারা না দিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে না ইহাতে ঈলাও হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত দেখা ও কথাবার্তা বলা হারাম নহে, তবে গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** সর্বদার জন্য যেহার না করিয়া একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিল। যেমন বলিল, "এক বৎসরের জন্য বা চারি মাসের জন্য তুই আমার মায়ের সমতুল্য" তাহা হইলে নির্ধারিত সময় যেহার থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে সহবাস করিতে চাহিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের পর সহবাস করিলে কিছুই দিতে হইবে না। স্ত্রী তাহার জন্য হালাল হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যেহারেও যদি তৎক্ষণাৎ ইন্‌শাআল্লাহ্ বলিয়া ফেলে, তবেও কিছুই হয় নাই।

৯। **মাসআলা ঃ** নাবালেগ ছেলে এবং উন্মাদ পাগল যেহার করিতে পারে না। করিলেও কিছুই হইবে না। যাহার সহিত এখনও বিবাহ হয় নাই, এমন স্ত্রীলোকের সহিত যেহার করিলেও কিছু হইবে না। এখন তাহার সহিত বিবাহ দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলা ঃ যদি যেহারের শব্দ কয়েকবার বলে। যেমন, দুইবার তিনবার এই কথাই বলিল যে, তুই আমার জন্য মায়ের ন্যায়; এরূপ যে কয়বার বলিয়াছে, ঐ পরিমাণ কাফ্ফারা দিতে হইবে। অবশ্য দুই বা তিনবার যদি কথাটি পাকা ও মজবুত করার নিয়্যতে বলিয়া থাকে এবং নূতন করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিয়া থাকে, তবে একই কাফ্ফারা দিবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কয়েক স্ত্রীকে এরূপ বলিয়া থাকে, তবে যে কয়েকজন স্ত্রী থাকিবে, তত কাফ্ফারা দিবে।

১২। মাসআলা ঃ যদি 'তুমি আমার মার তুল্য, তুমি আমার ভগ্নীর তুল্য' না বলিয়া থাকে (অর্থাৎ তুল্য শব্দ না বলে) শুধু 'তুমি আমার মা' 'তুমি আমার ভগ্নী' বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে যেহার হইবে না, স্ত্রী হারাম হইবে না। অবশ্য এরূপ বলা অন্যায় ও গোনাহ্। তদ্রূপ ডাকিবার সময় এরূপ বলা যে, আমার বোন, অমুক কাজ কর, এরূপ বলাও অন্যায়, তবে ইহাতে যেহার হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, যদি তোমাকে রাখি, তবে মাকে রাখিলাম। অথবা বলিল, যদি তোমার সহিত সহবাস করি, তবে যেন মায়ের সহিত সহবাস করি। ইহা অত্যন্ত খারাপ কথা, অত্যন্ত গোনাহের কথা, কিন্তু ইহাতে যেহার হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ যদি বলে, তুমি আমার জন্য মায়ের ন্যায় হারাম, তবে তালাকের নিয়্যতে বলিয়া থাকিলে তালাক হইবে, আর যেহারের নিয়্যত করুক বা কিছুই নিয়্যত না করুক, যেহার হইবে, কাফ্ফারা দিয়া সহবাস করিতে পারিবে।

কাফ্ফারার বয়ান

১। মাসআলা ঃ যেহারের কাফ্ফারা রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায়। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পূর্বেই পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় ভাল করিয়া দেখিবে। এখানে কতকগুলি জরুরী কথা বর্ণনা করিতেছি, তাহা তথায় বর্ণনা করা হয় নাই।

২। মাসআলা ঃ সামর্থ্য থাকিলে পুরুষ একলাগা ৬০টি রোযা রাখিবে। মাঝখানে কোন রোযাই ছুটিতে পারিবে না। রোযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস করিতে পারিবে না। রোযা শেষ হইবার পূর্বে, রাত্রেই হউক বা দিনেই হউক, স্বেচ্ছায় হউক, বা ভুলে হউক যদি স্ত্রী-সহবাস করে, তবে পুনঃ প্রথম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত রোযা রাখিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ যদি চাঁদের মাসের প্রথম তারিখ হইতে রোযা রাখা শুরু করে, তবে পুরা দুই মাস রোযা রাখিবে। ৩০, ৩০ করিয়া পুরা ৬০ দিন হউক, অথবা তার চেয়ে কম দিন হউক। উভয় প্রকারের কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। প্রথম তারিখ হইতে শুরু না করিয়া থাকিলে পুরা ৬০ দিন রোযা রাখিতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ রোযার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করিতে শুরু করিয়াছে। কাফ্ফারা পুরা হইবার পূর্ব দিনে বা রাত্রে ভুলে সহবাস করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কাফ্ফারা দোহ্রাইতে হইবে। (অর্থাৎ, পুনরায় প্রথম হইতে রোযা শুরু করিতে হইবে।)

৫। মাসআলা ঃ রোযা রাখার শক্তি না থাকিলে ৬০ জন গরীব-মিসকীনকে দুই বেলা আহার করাইবে, অথবা প্রত্যেককে /২ সের করিয়া গেঁহু দিবে।

সমস্ত ফকীরকে যদি এখনও আহার করাইয়া শেষ করে নাই, মাঝখানে হঠাৎ সহবাস করিয়া ফেলিয়াছে ইহাতে গোনাহ্ হইবে কিন্তু কাফ্‌ফারা দোহ্‌রাইতে হইবে না। খানা খাওয়াইবার ছুরত (নিয়ম) পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৬। মাসআলা ঃ কাহারও জিম্মায় যেহারের দুইটি কাফ্‌ফারা ছিল। সে ৬০ জন মিস্‌কীনকে চার চার সের গেঁহু দিয়া দিল এবং মনে করিল, প্রত্যেক কাফ্‌ফারার জন্য দুই সের করিয়া দিতেছি। এমতাবস্থায় এক কাফ্‌ফারাই আদায় হইবে। অপর কাফ্‌ফারা আবার দিবে। আর যদি রোযা ভঙ্গের জন্য এক, যেহারের জন্য এক কাফ্‌ফারা থাকিয়া থাকে, উহা আদায়ের জন্য যদি এরূপ করিয়া থাকে, তবে উভয় কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে।

লে'আনের বয়ান

১। মাসআলা ঃ কেহ আপন স্ত্রীর উপর যিনার তোহ্‌মত লাগাইল, অথবা যে সন্তান পয়দা হইল তাহাকে বলিল, ইহা আমার নহে, জানি না কাহার সন্তান। ইহার বিধান হইল এই—স্ত্রী কাজী কিংবা মুসলমান শরয়ী হাকেমের নিকট নালিশ দায়ের করিবে। হাকেম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কসম লইবেন। প্রথমে স্বামী হইতে এইভাবে বলাইবেন—আমি খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, যে তোহ্‌মত, তাহার উপর লাগাইয়াছি, ইহাতে আমি সত্য আছি। অর্থাৎ, ঘটনা সত্য। এইভাবে চারিবার বলিবে। পঞ্চমবার বলিবে, আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তবে আমার উপর খোদার লা'নত পড়ুক।

পুরুষ পাঁচবার বলার পর স্ত্রী চারিবার বলিবে, আমি খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, তিনি আমার উপর যে তোহ্‌মত লাগাইয়াছেন উহা মিথ্যা। আর পঞ্চমবার বলিবে, এই তোহ্‌মত লাগাইবার ব্যাপারে যদি তিনি সত্য হন, তবে আমার উপর খোদার গযব পড়ুক। এইরূপে উভয়ে কসম খাওয়ার পর হাকেম উভয়কে পৃথক করিয়া দিবেন এবং ইহাতে বায়েন তালাক বর্তিবে। এই সান্তানকে পিতার সন্তান বলা যাইবে না, উহাকে মায়ের হাওলা করিয়া দিবে। এরূপ কসম করাকে শরীঅতের ভাষায় "লে'আন" বলে।

কোরআন শরীফ পাঠের ফযীলত

১। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথাবার্তা বলিতে চায়, তবে সে কোরআন শরীফ পড়ুক। (অর্থাৎ কোরআন শরীফ পড়া যেন আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলা।) মানবের মধ্যে সমধিক ধনী ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্‌র কোরআন বহনকারী। (অর্থাৎ যাহাদের সিনার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফ রাখিয়াছেন।) উদ্দেশ্যগত অর্থ যাহারা কোরআন শরীফ পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, তাহাদের চাইতে ধনী আর কেহ নাই। উহা আমল করার বরকতে আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করিয়া বাতেনী ধন প্রদান করেন। আর যাহেরী আর্থিক সচ্ছলতাও লাভ হয়। —আহ্‌মদ, হাকেম

এ সম্পর্কে হযরত হাসান বছরী (রাঃ) হইতে একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণিত আছে—

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্যে খলীফার দ্বারদেশে যাতায়াত করিত। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, যাও বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র কিতাব (কোরআন মজীদ) তেলাওয়াত কর। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেল। ইহার পর

হযরত ওমর (রাঃ) দীর্ঘদিন যাবৎ তাহাকে দেখিতে পান নাই। এক দিন তিনি স্বয়ং তাহার সন্ধান করিয়া অনুযোগ করিলেন (অর্থাৎ বলিলেন,) আমি তোমার সন্ধান করিতেছিলাম। কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? (কেহ যদি কাহারও নিকট সর্বদা যাতায়াত করে, আর হঠাৎ ঐ যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়, তবে স্বভাবতঃই সে চিন্তিত হইয়া পড়ে যে, লোকটার কি হইল, কি অবস্থায় আছে ইত্যাদি।) উত্তরে লোকটি আরয করিল, আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন জিনিস পাইয়াছি যাহা আমাকে ওমরের দরওয়াজার মুখাপেক্ষী হইতে বে-পরোয়া করিয়া দিয়াছে। (অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন মজীদে আমি এমন আয়াত প্রাপ্ত হইয়াছি যাহার বরকতে সৃষ্টজীব হইতে আমার দৃষ্টি উঠিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত বিষয়ের অভাব মোচনকারী আল্লাহ্‌র উপর আমার ভরসা জন্মিয়াছে।) তোমার কাছে দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই আসিতাম। এখন আসিয়া কি করিব? এই ব্যক্তি যে আয়াতের বরকতে হযরত ওমরের দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা নিম্ন আয়াতের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতই হইবে—যেমন বলা হইয়াছে— وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

অর্থাৎ, তোমাদের রিযিক আসমানেই রহিয়াছে (তথা হইতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তোমাদের রিযিক পাঠান হয়) এবং যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে (উহাও আসমানে আছে) অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের রিযিক ইত্যাদি যাবতীয় কার্যের ব্যবস্থা আমারই দরবার হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমা ব্যতিরেকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কি সার্থকতা থাকিতে পার? —সূরা যারিয়া

২। **হাদীসঃ** افضل العبادة تلاوة القرآن রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম এবাদৎ কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। (অর্থাৎ, ফরয এবাদৎসমূহের পর সর্বোত্তম নফল এবাদত হইল কোরআন মজীদ পাঠ করা)। —কান্‌যুল উম্মাল

৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যাহারা কোরআন মজীদ ইয়াদ করিয়াছে তাহাদের তা'যীম কর। কোরআন ইয়াদকারীকে যাহারা তা'যীম করিবে, তাহারা যেন আমাকেই তা'যীম করিল। (আর রাসূলুল্লাহ্‌কে তা'যীম করা ওয়াজেব, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।) [কোরআন শরীফ ইয়াদকারীকে তা'যীম করা যখন হুযূরকে তা'যীম করার সমতুল্য তখন কোরআন ইয়াদকারীকেও তা'যীম করা জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হইল।]

—দায়লমী

(**হাদীসঃ** তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যে কোরআন শিক্ষা করিয়াছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়াছে। —ইব্‌নে মরদুবিয়া)

৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা দিয়াছে এবং উহাতে যাহা আছে তদনুযায়ী আমল করিয়াছে, (অর্থাৎ, যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কামের উপর আমল করিয়াছে) আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির পিতামাতাকে এমন একটি নূরের টুপী পরাইয়া দিবেন, যাহার আলো দুনিয়ায় তোমাদের ঘরে সূর্যের আলো পতিত হইলে ঘর যেরূপ আলোকিত হইয়া যায়, উহা অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হইবে। (কোরআন অনুযায়ী আমলকারীর পিতাকে আল্লাহ্ পাক যখন এত উচ্চ মার্যাদা দান করিবেন; তখন স্বয়ং কোরআন অনুযায়ী আমলকারীকে কত অধিক মর্যাদা দান করিবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।)

৫। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি কোরআন পড়িল (শিক্ষা করিল) আর মনে করিল যে, সে যে নেয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছে খোদার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোরআন শিক্ষায় বঞ্চিত অন্য কোন শিক্ষায়

শিক্ষিত অপর কাহাকেও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর নেয়ামত প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় ঐ জিনিসকে ছোট করিল, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বড় করিয়াছেন এবং ঐ জিনিসকে বড় করিল আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ছোট করিয়াছেন।

কোরআন শিক্ষিতদের সঙ্গত নহে যে, যদি তাঁহার সঙ্গে কেহ কঠোর ব্যবহার করে তিনিও তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিবেন, আর যে তাঁহার সহিত মূর্খোচিত ব্যবহার করিবে, তিনিও তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন, বরং কোরআনের মাহাত্ম্যের দরুন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত। (অর্থাৎ, আলেম ও কোরআন শিক্ষিতদের উচিত তাঁহারা যেমন পৃথিবীর যাবতীয় নেয়ামত অপেক্ষা কোরআনের এল্‌মকে সর্বাধিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যদি তাঁহারা অন্য কোন জিনিসকে কোরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে খোদা যাহাকে বড় করিয়াছেন তাহাকে হেয় ও ছোট করিলেন। আর হাকেম (খোদা) যাহাকে বড় করিয়াছেন তাহাকে ছোট করা কত বড় গুরুতর অপরাধ (তাহা চিন্তা করা উচিত)। কোরআন শিক্ষিতদের উচিত তাহারা যেন জনগণের সহিত মূর্খোচিত এবং দুর্ব্যবহার না করেন; কোরআনের আয্‌মত এবং ইজ্জত ইহাই চায়। জনগণের মধ্যে যদি কেহ তোমাদের সহিত মূর্খোচিত ব্যবহার করে, তবে তাহা মা'ফ করিয়া দেওয়া উচিত।

৬। হাদীসঃ

اَلْقُرْاٰنُ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ○ (رواه ابو نعيم عن ابن عمر)

আসমান, যমীন এবং তন্মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের চেয়ে কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়। অর্থাৎ, কোরআন মজীদের মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির উপরে। আর কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমধিক প্রিয়।

[**হাদীসঃ** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, লোহায় পানি লাগিলে যেমন মরিচা পড়ে, ক্বলব অর্থাৎ হৃদয় মধ্যেও (আল্লাহ্ হইতে গাফেল থাকিলে ও পাপ করিলে) মরিচা পড়িয়া থাকে। ছাহাবিগণ আরয করিলেন, মরিচা পরিষ্কারের উপায় কি? তিনি ফরমাইলেন, ইহার উপায় মৃত্যুকে অত্যধিক স্মরণ করা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। —বায়হাকী। —অনুবাদক]

৭। হাদীসঃ

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ لَايَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يَّخْذُلَهٗ وَلَايَسْتَاْثِرَ عَلَيْهِ فَاِنْ هُوَ فَعَلَهٗ قَصَمَ عُرْوَةً مِّنْ عُرَى الْاِسْلَامِ - (رواه ابن عدى و الطبرانى)

"রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র) কোন বান্দাকে খোদার কিতাব (কোরআন শরীফ) হইতে একটি আয়াত শিক্ষা দিল এই (শিক্ষাদাতা) তাহার (ঐ শিক্ষার্থীর) মনিব হইয়া গেল। অতএব, এই শিক্ষার্থীর (তালেবে এলমের) পক্ষে প্রয়োজনের সময় ঐ ওস্তাদের সাহায্য হইতে বিরত থাকা সঙ্গত হইবে না এবং ঐ ওস্তাদের উপর অন্য কাহাকেও অধিক মর্যাদা দান করাও সঙ্গত হইবে না, যে প্রকৃতপক্ষে ঐ ওস্তাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী না হয়। যদি ঐ তালেবে এল্‌ম এরূপ করে, তবে সে ইসলামের হল্‌কা (কড়া) সমূহের একটি হল্‌কা ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অর্থাৎ, এরূপ অসঙ্গত কাজ করিলে সে ইসলামের মধ্যে ভীষণ

ফেৎনা সৃষ্টিকারী এবং শরীঅতের মহা বিধান লঙ্ঘনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে; যাহার ফলে ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ ও কঠিন শাস্তির আশঙ্কা রহিয়াছে।"

৮। হাদীস ঃ

عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَّمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهٗ ـ اسناده حسن

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমাদের বড়দিগকে সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ (সুলভ ব্যবহার) করে না এবং আমাদের আলেমদের হক ও মর্যাদা বুঝে না (শ্রদ্ধা করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে। এখানে যে কোরআন শরীফ পড়ে এবং যে শিক্ষা দেয় উভয়েই আলেম শব্দের অন্তর্ভুক্ত [কাজেই আলেম ও তালেবে এল্‌ম উভয়কে শ্রদ্ধা করা জরুরী] যে ব্যক্তি এই হাদীস অনুযায়ী কার্য না করিবে, সে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উম্মতের বাহিরে, তাহার ঈমান দুর্বল। সুতরাং বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা এবং আলেমের হক ও মর্যাদা বুঝা এবং আলেমদের শ্রদ্ধা করা একান্ত কর্তব্য।"

৯। হাদীস ঃ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ শিক্ষা করিয়াছে, উহার অর্থ ও তফসীর বুঝিয়াছে অথচ তদনুযায়ী আমল করিল না, সে দোযখকে আপন বাসস্থান নির্ধারিত করিয়া লইল। (অর্থাৎ, কোরআন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করা অত্যন্ত কঠিন গোনাহ্। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া জাহেলদের খুশী হইবার কারণ নাই যে, আমরা তো কোরআন পড়িই নাই, সুতরাং তদনুযায়ী আমল না করিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, এই সমস্ত জাহেল ডবল আযাবের উপযোগী হইবে। একটি এল্‌ম হাছেল না করার, অপরটি আমল না করার)
—আবুনঈম

১০। হাদীস ঃ

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلَانًا يَّقْرَأُ بِالَّيْلِ كُلِّهٖ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ سَتَنْهَاهُ قِرَائَتُهٗ

(سعيد بن منصور عن جاب)ـ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করা হইল, অমুক (ব্যক্তি) সারা রাত্রি জাগিয়া কোরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু যখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসে, তখন চুরি করে। (উত্তরে) তিনি বলিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহার এই কোরআন পাঠ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। (অর্থাৎ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের বরকতে শীঘ্রই তাহার এই অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে।)

১১। হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িবে এবং উহা হেফ্‌য করিবে, উহার (নির্দেশিত) হালালকে হালাল মান্য করিবে এবং উহার (নির্দেশিত) হারামকে হারাম মান্য করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন এবং তাহার খান্দানের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিবেন, যাহাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। —আহ্‌মদ, তিরমিযী

১২। হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খোদার কিতাব (কোরআন শরীফ) হইতে ওযূর সহিত একটি অক্ষর শুনিল, তাহার আমলনামায় দশটি নেকী (দশটি নেকীর সওয়াব) লিখা হইবে এবং তাহার দশটি গোনাহ দূর করিয়া (মিটাইয়া) দেওয়া হইবে, তাহার দশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অক্ষর নামাযে বসিয়া পড়িবে, (যখন বসিয়া নামায পড়িবে) তাহার আমলনামায় পঞ্চাশটি নেকী (৫০টি নেকীর ছওয়াব) লিখা হইবে। তাহার পঞ্চাশটি গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পঞ্চাশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। উল্লিখিত নামাযের মুরাদ হইতেছে নফল নামায। কেননা, ফরয নামায বিনা ওযরে বসিয়া পড়া জায়েয নাই। ওযরবশতঃ বসিয়া পড়িলেও খাড়া হইয়া পড়ার পূর্ণ ছওয়াব পাইবে। ওযর ব্যতীত নফল নামায বসিয়া পড়া জায়েয আছে। (কিন্তু অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যাইবে। ওযরের কারণে নফল নামায বসিয়া পড়িলেও পূর্ণ ছওয়াব পাইবে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে (নামাযে) দাঁড়াইয়া একটি হরফ পড়িবে, তাহার আমলনামায় একশত নেকী (একশত নেকীর ছওয়াব) লিখা হইবে। তাহার একশত গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার একশত (দরজা) মরতবা বুলন্দ করা হইবে। যে ব্যক্তি কোরআন পড়িতে পড়িতে উহা (পূর্ণ) খতম করিল—আল্লাহ্ তা'আলা (আপন দরবারে) তাহার জন্য দো'আ লিখিয়া লইবেন, যাহা হয়ত তৎক্ষণাৎ কবূল হইবে। অথবা ভবিষ্যতে কবূল হইবে। (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে হউক বা পরে হউক তাহার দো'আ কবূল হইবে।)

১৩। হাদীস ঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهٗ ـ (رواه البيهقى)

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার তা'রীফ প্রশংসা করিল (আল্‌হামদুলিল্লাহ বলুক বা অনুরূপ অর্থবোধক অন্য কোন শব্দ বলুক ইহাতে আল্লাহ্‌র তা'রীফ হইয়া যাইবে)এবং নবী আলাইহিস্‌সালামের উপর দুরূদ পড়িল এবং আল্লাহ্‌র নিকট নিজের গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল, নিঃসন্দেহ সে কল্যাণকে উহার স্থান হইতে চাহিয়া লইল। অর্থাৎ দ্রুত কবূল হওয়ার জন্য দো'আ করার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী সে দো'আ করিয়াছে; সুতরাং তাহার দো'আ দ্রুত কবূল হওয়ার আশা রহিয়াছে। (মোটকথা, কোরআন পাঠ করিয়া পরে আল্লাহ্‌র হামদ তা'রীফ ও দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিলে দো'আ কবূল হওয়ার প্রবল আশা থাকে।)

১৪। হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের স্ত্রীদিগকে সূরা-ওয়াক্বিয়া শিখাও। নিশ্চয় এই সূরা ধন-সম্পদ আনয়নকারী অর্থাৎ সূরা-ওয়াক্বিয়া পাঠ করিলে ধনাগম হয় ও স্বচ্ছলতা আসে; রূহানী সম্পদও লাভ হয়। যেমন, অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা-ওয়াক্বিয়া পড়িবে কখনও রিযিকের অভাব তাহার হইবে না। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের অন্তর বেশী দুর্বল থাকে। সামান্য অভাব অনটনে ইহারা পেরেশান হইয়া পড়ে। তাই স্ত্রীলোকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য সূরা-ওয়াক্বিয়া পাঠ করা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই উপকারী। —দায়লমী

১৫। হাদীস ঃ اَحْسَنُ النَّاسِ قِرَائَةً نِ الَّذِىْ اِذَا قَرَءَ اَيَّةً اِنَّهٗ يَخْشَى اللّٰهَ ـ (كنز العمال)

"কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে কোরআন শরীফ পাঠকালে মনে করে যে, সে খোদাকে ভয় করে। (অর্থাৎ তেলাওয়াতকারীকে দেখিয়া দর্শক এ কথা মনে করে যে, সে খোদাকে ভয় করিতেছে।) মোটকথা, এমন সতর্কতার সহিত পড়ে, যেন কোন ভীত ব্যক্তি হাকেমের সম্মুখে কোন প্রকার ত্রুটি ও বেআদবী প্রকাশ পাইবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কথা বলিয়া থাকে।"

কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিবার উত্তম পন্থা এই যে, ওযূ সহকারে ক্বেব্‌লামুখী হইয়া বসিবে। ভক্তি ও নম্রতার সহিত পাঠ করিবে। আর একথা মনে করিবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলিতেছি। অর্থ জানা থাকিলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া পড়িবে। যেখানে রহ্‌মতের আয়াত আসিবে, সেখানে রহ্‌মতের দো'আ করিবে। যেখানে আযাবের আয়াত আসিবে, সেখানে দোযখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। পড়া শেষ হইলে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা তৎপর রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করিয়া গোনাহ্ মা'ফ চাহিবে। অথবা যে কোন নেক দো'আ করিবে এবং পুনরায় দুরূদ শরীফ পড়িবে। কোরআন তেলাওয়াতের সময় মনে বাজে খেয়াল আসিতে দিবে না। যদি কোন খেয়াল আসিয়াই যায়, তবে ঐ দিকে লক্ষ্য করিবে না। আপনা হইতেই ঐ খেয়াল চলিয়া যাইবে। তেলাওয়াতের সময় যথাসম্ভব পাক ছাফ কাপড় পরিবে।

(হাদীস ঃ শরহে এহ্‌ইয়াউল উলুম গ্রন্থে হযরত আমর ইব্‌নে ময়মুন (রাঃ) হইতে (একটি হাদীস) বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামায পড়িবার পর কোরআন শরীফ খুলিয়া একশত আয়াত পরিমাণ পড়িয়া লইবে, তাহার নামে সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ ছওয়াব লিখিত হইবে।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন—যাহার প্রত্যেক রাবী বলেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। তিনি তাঁহার ওস্তাদের নিকট অভিযোগ করিলে ওস্তাদ তাঁহাকে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে বলিলেন। তিনি এইরূপ করিয়া উপকার পান—দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়াতে বিশেষ উপকার আছে। —ফাযায়েলে কোরআন

হযরত আউস সাক্বাফী (রাঃ) বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোরআন শরীফ না দেখিয়া (মুখস্থ) পড়িলে হাজার দরজা সওয়াব পাওয়া যায় আর দেখিয়া পড়িলে উহার সওয়াব দুই হাজার দরজা পর্যন্ত বর্ধিত হইয়া যায়।

—বায়হাকী, ফাযায়েলে কোরআন

তজবীদের বয়ান (পরিবর্ধিত)

[ছহীহ্ করিয়া কোরআন শরীফ পড়ার নিয়মাবলী]

মাসআলা ঃ তজবীদ অর্থ কোরআন শরীফ ছহীহ্ পড়া। কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া পড়ার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয। এ সম্বন্ধে অবহেলা বা আলস্য করা শক্ত গোনাহ্। (ছহীহ্ করিয়া পড়ার অর্থ আরবী অক্ষরগুলিকে আরববাসী যেরূপ উচ্চারণ করে তদ্রূপ উচ্চারণ করা এবং ইমামগণ যে সমস্ত ক্বায়দা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত ক্বায়দা অনুসারে আরবী লাহ্‌জায় কোরআন শরীফ পাঠ করা। উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট মশ্‌ক্ করা ব্যতিরেকে শুধু কিতাব দেখিয়া কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া পড়া যায় না। কাজেই প্রত্যেকেরই উপযুক্ত ওস্তাদ অন্বেষণ করা দরকার। এখানে আমরা ওস্তাদ ও শাগরেদের সাহায্যার্থে অতি সহজে ও সংক্ষেপে মোটামুটি ক্বায়দাগুলি লিখিয়া দিতেছি—)

ক্বায়দা ঃ যে হরফগুলি ভাল মত লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ না করিলে এক হরফের পরিবর্তে আর এক হরফ উচ্চারণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে, সেই হরফগুলি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যাহাতে এক হরফের পরিবর্তে আর এক হরফ "লাহানে জলী" হইয়া গোনাহ্‌গার না হইতে হয় যথা—

(১) আলিফ ا 'আয়েন ع এবং হামযা ء (-আয়েনকে গলার মাঝখান হইতে ডাবাইয়া নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এবং হামযাকে গলার নীচ ছিনার কাছ হইতে শক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। হামযা যেন নরম না হয়। হামযার আওয়ায গলার মধ্যে বাজিয়া উঠিবে।)

(২) ت এবং ط -(ت কে বারিক করিয়া এবং ط কে মুখ গোল করিয়া মোটা করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।)

(৩) ج এবং ز - ج কে শক্ত করিয়া জিহ্বার মাঝখানের এবং তালুর সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ز কে জিহ্বার আগা দিয়া দাঁতের গোড়ার সাহায্যে নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৪) ح এবং ه -বড় হে বা হায়েহুত্তি এবং ছোট হে বা হায়ে হাওয়ায। ح কে গলার মধ্য হইতে গলা ডাবাইয়া এবং ه কে গলার নীচ হইতে ছিনার কাছ হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৫) ث এবং س - ث কে নরম করিয়া জিহ্বার অগ্রভাগকে সামনের দাঁতের অগ্রভাগে লাগাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং س কে কিছু শক্ত করিয়া দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৬) س এবং ص -(س বারিক হইবে এবং ص মোটা হইবে)

(৭) د এবং ض- د কে সামনের দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে; কিন্তু ض কে সামনের দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিলে ভয়ানক গলতি হইবে। —১০ নং দ্রষ্টব্য

(৮) ذ এবং ز - ذ কে সামনের দাঁতের অগ্রভাগের সাহায্যে নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ز কে দাঁতের গোড়ার সাহায্যে কথঞ্চিৎ শক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৯) ذ এবং ظ - ذ বারিক হইবে এবং ظ মোটা হইবে।

(১০) ظ -ض- ظ কে সামনের দাঁত এবং জিহ্বার অগ্রভাগের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ض কে জিহ্বার পার্শ্বদেশ এবং মাড়ির দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(১১) ع - غ কে গলা ডাবাইয়া গলার ভিতর হইতে উঠাইতে হইবে।

(১২) ق এবং ك -বড় এবং ছোট ক্বাফ- ق কে গলা ডাবাইয়া গলার ভিতর হইতে উঠাইবে এবং ك কে গলার বাহির হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে। —অনুবাদক

(১৩) ف কে উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ঠোঁটের ভিতরাংশের সাহায্যে উচ্চারণ করিবে। —অনুবাদক

১। ক্বায়দা ঃ غ ظ ط ش ص خ (এবং) ق এই সাতটি হরফ সর্ববস্থায় পোর অর্থাৎ, মোটা হইবে, কোন অবস্থাতেই বারিক বা চিকন হইবে না। পক্ষান্তরে ز -এর উপর যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে মোটা হইবে, নতুবা বারিক হইবে; আর ل হামেশা চিকন হইবে, শুধু লফ্‌যে আল্লাহ্‌র মধ্যে যখন লামের আগে পেশ বা যবর থাকিবে, তখন পোর হইবে।

২। **ক্বায়দা ঃ** م - ن -এর উপর তশ্‌দীদ থাকিলে গুন্না করিতে হইবে। অর্থাৎ, আওয়ায নাকের মধ্যে নিয়া এক আলিফ পরিমাণ দেরী করিয়া উচ্চারণ করিবে।

৩। **ক্বায়দা ঃ** যবরের পরে যদি আলিফ না থাকে, তবে যবরকে টানিয়া পড়িবে না, খাট করিয়া পড়িবে। এইরূপে যেরের পর যদি ى এবং পেশের পরে যদি و না থাকে, তবে যেরকে এবং পেশকেও টানিয়া পড়িতে হইবে না। (এইরূপ টানিয়া পড়া অতি বড় দোষ। খুব লক্ষ্য করিয়া এই দোষ এড়াইয়া চলিবে।) কোন কোন লোক الحمد কে الحمدو এবং ملك কে ملكى এবং اياك কে اياكا করিয়া পড়ে ইহা অতি মারাত্মক ভুল। এই ভুল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবসময় সতর্ক থাকিবে।

এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে যেখানে যবরের পর আলিফ বা খাড়া আলিফ আছে এবং যেরের পর যেখানে ى আছে, বা খাড়া যের আছে অথবা পেশের পরে যেখানে و আছে অথবা উল্টা পেশ আছে সেখানে এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে। (এইরূপ জায়গায় খবরদার যেন কমান না হয়।)

৪। **ক্বায়দা ঃ** (উরদু ও পার্সীতে সাধারণতঃ যেরকে আমাদের বাংলা এ-কারের মত এবং পেশকে ও-কারের মত পড়া হয়; কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে যেরকে (হ্রস্ব ই-কারের মত) একটু ى -এর গন্ধ দিয়া এবং পেশকে (হ্রস্ব উ-কারের মত) একটু و -এর গন্ধ দিয়া পড়িতে হইবে; (কিন্তু খবরদার যেন পুরা ى অর্থাৎ দীর্ঘ ঈ-কার এবং পুরা و অর্থাৎ, দীর্ঘ উ-কার না হইয়া যায়, অন্যথায়, মস্ত বড় ভুল হইয়া যাইবে।)

৫। **ক্বায়দা ঃ** যেখানে নূনের উপর জযম থাকিবে এবং তারপর নিম্নের ১৫টি অক্ষরের কোন একটি অক্ষর থাকিবে, সেখানে গুন্না করিয়া অর্থাৎ, নাকের মধ্যে আওয়ায নিয়া এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে। ১৫টি অক্ষর এই—

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

যেমন

اَنْتُمْ - مِنْ ثَمَرَةٍ - فَاَنْجَيْنَاكُمْ - اَنْدَادًا - اَنْذَرْتُهُمْ - اَنْزَلَ مِنْسَاتَهٗ يَنْشُرْ - لِمَنْ صَبَرَ - مَنْضُوْدٍ - فَاِنْ طِبْنَ - فَانْظَرَ - يُنْفِقُوْنَ - مِنْ قَبْلِكَ - اِنْ كُنْتُمْ ○

৬। **ক্বায়দা ঃ** এইরূপে যদি কোন হরফের উপর দুই পেশ বা দুই যবর বা দুই যের থাকে এবং সে কারণে একটি নূন উচ্চারিত হয় এবং তাহার পর উপরোক্ত ১৫টি হরফের মধ্যে কোন একটি হরফ আসে, তবে সে ছুরতেও ঐ উচ্চারিত নূনের কারণে গুন্না করিতে হইবে। যেমন—

جَنّٰتٌ تَجْرِىْ - جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى - مِنْ نَّفْسٍ شَيْئًا - رِزْقًا قَالُوْا - رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ - وَغَيْرَهٗ ○

৭। **ক্বায়দা ঃ** যে নূনের উপর জযম থাকে, তাহার পরে যদি ر বা ل আসে তবে নূনের উচ্চারণ মাত্রই থাকিবে না; গুন্নাও থাকিবে না; বরং ر এবং ل -এর দ্বিত্ব অর্থাৎ, তাশ্‌দীদ হইয়া যাইবে। যেমন— وَلٰكِنْ لَّايَشْعُرُوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ○

৮। **ক্বায়দা ঃ** এইরূপে যদি কোন হরফের উপর দুই পেশ, দুই যবর বা দুই যের থাকে এবং সে কারণে নূনের আওয়ায উচ্চারিত হয় তারপর ر বা ل আসে তবে ঐ ছুরতেও নূনের আওয়ায মাত্রই থাকিবে না, গুন্নাও থাকিবে না; বরং ر এবং ل -এর দ্বিত্ব হইয়া যাইবে;

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৯। ক্বায়দা ঃ যদি নূনের উপর জযম থাকে এবং তাহার পর ب থাকে তবে ঐ নূনকে মীমের মত পড়িতে হইবে এবং গুন্না করিতে হইবে। যেমন اَنْبِئْهُمْ কে اَنْبِئْهُمْ পড়িতে হইবে। এইরূপ যদি দুই যবর, দুই যের বা দুই পেশওয়ালা হরফের পর ب থাকে, তবেও নূনের আওয়ায না পড়িয়া মীমের আওয়ায পড়িতে হইবে এবং গুন্নাও করিতে হইবে। যেমন— اَلِيْمٌ بِمَا কে اَلِيْمٌ بِمَا পড়িবে। কোন কোন ছাপার কোরআন শরীফে এইরূপ স্থানে ছোট একটি মীম অতিরিক্ত লিখিয়া দিয়া থাকে, আবার কোন জায়গায় লিখে না; কিন্তু এই ক্বায়দা যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানে লিখুক বা না লিখুক মীম পড়িতে হইবে।

১০। ক্বায়দা ঃ যেখানে মীমের উপর জযম থাকিবে এবং তাহার পর ب আসিবে, সেখানে গুন্না করিতে হইবে— يَعْتَصِمْ بِاللهِ

১১। ক্বায়দা ঃ যে ক্ষেত্রে কোন হরফের উপর দুই যবর বা দুই পেশ বা দুই যের থাকিবে এবং তারপর যে হরফ আছে তাহার উপর জযম থাকিবে, সে ক্ষেত্রে দুই যবরের পরিবর্তে এক যবর পড়িতে হইবে এবং দুই যবরের পরে যে আলিফ থাকে, সে আলিফ পড়িতে হইবে না; বরং আলিফের স্থানে একটি নূনে যের দিয়া পরের হরফের সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যেমন— خَيْرًا الْوَصِيَّةُ কে خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ হইবে। এইরূপে দুই যেরের স্থানে এক যের পড়িবে এবং একটি নূনে যের দিয়া পরের হরফের সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যেমন— فَخُوْرٍ الَّذِيْنَ কে فَخُوْرِنِ الَّذِيْنَ পড়িতে হইবে। এইরূপে দুই পেশের স্থানে এক পেশ পড়িতে হইবে। যেমন— نُوْحٌ اِبْنَهٗ কে نُوْحُ نِ ابْنَهٗ পড়িতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায় ছাপাতেই কোরআন শরীফের মধ্যে ছোট একটি 'নূন কুতনী' আকারে লিখিয়া দিয়া থাকে যদি নাও লিখে তবুও এই ক্বায়দা যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানে পড়িতে হইবে চাই লিখুক চাই না লিখুক।

১২। ক্বায়দা ঃ ر -এর উপর যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে ر কে পোর পড়িতে হইবে। যেমন— اَمْرُهُمْ شُوْرٰى - رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ر-এর নীচে যদি যের থাকে, ر কে বারীক পড়িতে হইবে। যেমন— غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ ر এর উপর যদি জযম থাকে এবং আগের হরফে যবর বা পেশ থাকে, তবে ر পোর হইবে (যেমন— مُرْسَلٌ - اَنْذَرْتَهُمْ আর যদি আগের হরফে যের থাকে, তবে ر বারীক হইবে। যেমন— لَمْ تُنْذِرْهُمْ ; ر -এর পোর এবং বারীক হওয়া সম্বন্ধে আরও কিছু ক্বায়দা আছে, তাহা এখন বুঝে আসিবে না বলিয়া এখানে লিখা হইল না। ওস্তাদের কাছে জানিয়া লইবে বা উপরের কিতাবে জানিতে পারিবে।

১৩। ক্বায়দা ঃ اَللهُ এবং اَللّٰهُمَّ এই দুই লফ্‌যের মধ্যে যে লাম আছে, এই লামের পূর্বে যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে লামকে পোর পড়িবে। যেমন— وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ - فَزَادَهُمُ اللهُ خَتَمَ اللهُ আর যদি লামের আগে যের থাকে, তবে লামকে বারীক পড়িবে।
যেমন— بِسْمِ اللهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

১৪। ক্বায়দা ঃ যেখানে গোল 'তে' লেখা থাকে, সেই লফ্‌যের উপর যদি 'অক্‌ফ করা হয়, তবে ঐ গোল ة 'তে' পৃথক লেখা থাক বা অন্য হরফের সহিত যোগে লেখা থাক, কিংবা ঐ গোল (ة) তে-এর উপর পেশ থাক, যবর থাক বা যের থাক অথবা দুই যবর থাক বা দুই পেশ থাক বা দুই যের থাক সব ছুরতেই ঐ গোল (ة) 'তে' (ه) হে ছাকেনের মত পড়িতে

হইবে। যেমনঃ طَيِّبَةً কে طَيِّبَهْ এবং قَسْوَةً কে قَسْوَهْ এবং وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ কে وَاٰتُوا الزَّكٰوهْ পড়িতে হইবে।

১৫। ক্বায়দাঃ একমাত্র গোল 'তে' (ة) ব্যতীত অন্য কোন হরফের উপর যদি যবর থাকে এবং সেই হরফের উপর অক্‌ফ্ করিতে হয়, তবে সেই হরফের পরে একটি আলেফ বাড়াইয়া পড়িতে হইবে। (প্রায়ই আলেফ লেখা থাকে, কোন ক্ষেত্রে যদি লেখা নাও থাকে, তবুও পড়িতে হইবে।) যেমন— نداء কে نداءا পড়িতে হইবে। এতদ্ব্যতীত দুই যের বা দুই পেশওয়ালা হরফের উপর অকফ্ করিতে হইলে যেরূপ এক যবর এক পেশ এক যেরওয়ালা হরফকে ছাকেন করিয়া অকফ করিতে হয়, তদ্রূপই করিতে হইবে।

১৬। ক্বায়দাঃ কোরআন শরীফের কোন কোন শব্দে এইরূপ চিহ্ন ـــ ~ থাকে, ইহাকে মদ বলে। যেখানে মদ থাকে সেখানে কিছু টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন— فِىٓ اٰذَانِهِمْ এখানে অন্য জায়গা হইতে কিছু বাড়াইয়া পড়িবে قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ এখানে অন্য জায়গা হইতে কিছু বাড়াইয়া পড়িবে وَلَا الضَّآلِّيْنَ এখানে অন্য জায়গা হইতে বাড়াইয়া পড়িবে।

১৭। ক্বায়দাঃ কোরআন শরীফের যেখানে ط বা م বা قف বা ق চিহ্ন থাকে সেখানে শ্বাস ছাড়িয়া দিয়া অক্‌ফ করিবে; আর যেখানে س বা سكته বা وقفه লেখা থাকে, সেখানে শ্বাস না ছাড়িয়া শুধু একটু চুপ করিয়া সামনে পড়িবে এবং যেখানে لا লেখা থাকে, সেখানে না থামা উচিত এবং যেখানে এক আয়াতের মধ্যে দুই জায়গায় তিন নোক্‌তা থাকে সেখানে দুই জায়গার এক জায়গায় থামা উচিত, যেখানে উপরে নীচে দুই রকম চিহ্ন থাকে সেখানে উপরটির আমল করিবে। আর যেখানে গোল আয়াত থাকে, সেখানেও থামা ভাল, তাছাড়া অন্য চিহ্নের জায়গায় অক্‌ফ করিতে পারে, নাও করিতে পারে। (যদি একান্ত শ্বাস টুটিয়া যায়, তবে শব্দের মাঝখানে ত কিছুতেই অক্‌ফ করিবে না করিলে শব্দটি শেষ করিয়া অকফ করিবে এবং পুনরায় ঐ শব্দ দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।)

১৮। ক্বায়দাঃ কোরআন শরীফে কোন হরফের উপর জযম থাকিলে এবং তাহার পরের অক্ষরের উপর তাশদীদ থাকিলে জযমওয়ালা হরফকে পড়িতে হইবে না। যেমন— قَدْتَّبَيَّنَ -এর মধ্যে د পড়া যাইবে না قَالَتْ طَّآئِفَةٌ এর মধ্যে ت পড়া যাইবে না لَئِنْ بَسَطْتَّ এর মধ্যে ط পড়া যাইবে না। اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ -এর মধ্যে ت পড়া যাইবে না اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمْ -এর ت পড়া যাইবে না اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ -এর মধ্যে ق পড়া যাইবে না। অবশ্য যদি জযমওয়ালা হরফ নূন ছাকেন বা নূনে তন্‌বীন হয় এবং তাহার পরে ى বা و -এর উপর তাশ্‌দীদ থাকে, তবে গোন্না করিয়া তাশ্‌দীদ আদায় করিতে হইবে। যেমন— ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ - وَمَنْ يَّقُوْلُ অর্থাৎ ن -এর আওয়ায নাকে পয়দা করিবে।

১। ফায়দাঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (১২শ) পারার ৪র্থ রুকূতে ৬ষ্ঠ আয়াতে যে مَجْرٖهَا শব্দটি আছে। এই শব্দটি ر -এর নীচে যে খাড়া যের লেখা থাকে, তাহা অন্যান্য খাড়া যেরের মত পড়া যাইবে না; (উহাকে বাংলা একারের মত পড়িতে হইবে এবং একারকে) একটু টানিয়া পড়িতে হইবে। যেমন—উর্দুতে ستارے -এর ر কে একার কিছু টানিয়া পড়িতে হয়।

২। **ফায়দা ঃ** حٰمٓ (২৬শ) পারার সূরা-হুজুরাত ২য় রুকূ ১ম আয়াতে যে بِئْسَ الْاِسْمُ শব্দটি আসিয়াছে, এই শব্দটি পড়ার নিয়ম এই যে, প্রথম ছিনের যবর পরের লামের সহিত মিলাইতে হইবে না; বরং লামে যের পড়িতে হইবে। এইরূপ পড়িতে হইবে بِئْسَ لِسْمُ

৩। **ফায়দা ঃ** تِلْكَ الرُّسُلُ (তৃতীয়) পারার সূরা-আলে ইমরান-এর শুরুতে যে الم 'আলিফ লাম মীম' আছে এবং তাহার পর الله লফ্‌য আছে। এই মীমকে আল্লাহ্ শব্দের লামের সহিত মিশাইতে হইবে। হেজ্জে এইরূপ হইবে মীম ইয়া যের মী, মীম লাম যবর মাল, মীমাল। কোন কোন লোক মীমমাল পড়িয়া বসে, উহা ভুল।

৪। **ফায়দা ঃ** কতকগুলি মকাম এরূপ আছে যে, লেখা হয় এক রকম এবং পড়া হয় অন্য রকম তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। কোরআন শরীফের এই মকামগুলি দেখিয়া বুঝিয়া লইবে। যথা—

১। **মকাম ঃ** কোরআন শরীফের মধ্যে যত লফ্‌যে اَنَا (অর্থ আমি) আছে সেখানে নূনের বাদের আলেফ পড়িতে হইবে না, শুধু নূন-যবর نَ পড়িতে হইবে।

২। **মকাম ঃ** কোরআন শরীফের মধ্যে যেখানে يَبْصُطُ লিখিয়াছে, প্রায় স্থানে ص দিয়া লিখিয়াছে এবং ص-এর উপর একটি ছোট س বানাইয়া দিয়াছে; এইরূপে بَسْطَةً ও ص দিয়া লিখিয়াছে এবং ص-এর উপর একটি ছোট س বানাইয়া দিয়াছে। এই সব জায়গায় ছোট س উপরে লেখা থাকুক বা না থাকুক ص পড়িতে হইবে না, س ই পড়িতে হইবে।

৩। **মকাম ঃ** لَنْ تَنَالُوْا (৪র্থ) পারায় ৬ষ্ঠ রুকূর প্রথম আয়াতে اَفَئِنْ এখানে ف-এর পর একটি আলেফ থাকে কিন্তু ঐ আলেফ পড়িবে না পড়িতে হইবে এইরূপ اَفَئِنْ

৪। **মকাম ঃ** لَنْ تَنَالُوْا (৪র্থ) পারায় ৮ম রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে لَااِلَى اللهِ অথচ পড়িতে হইবে لَ اِلَى اللهِ অর্থাৎ, লামের বাদে যে আলেফ লিখিয়াছে উহা পড়িতে হইবে না।

৫। **মকাম ঃ** لَايُحِبُّ اللهُ (৬ষ্ঠ) পারার নবম রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে لن تبوء অর্থাৎ, হামযার বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হয় না।

৬। **মকাম ঃ** قَالَ الْمَلَاءُ الَّذِيْنَ (৯ম) পারার তৃতীয় রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, ملائه অর্থাৎ লামের বাদে একটা আলেফ লেখা আছে, এই আলেফটি পড়িতে হইবে না। পড়িতে হইবে ملئه এইরূপে এই শব্দটি আরও কয়েক জায়গায় আছে সব জায়গায় এইরূপ আলেফ ছাড়িয়া দিয়াই পড়িতে হইবে; কিন্তু مَلَائِكَتِهٖ এর মধ্যে আলেফ পড়িতে হইবে, স্মরণ থাকে যেন।

৭। **মকাম ঃ** وَاعْلَمُوْا (১০ম) পারার ১৩ রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, لَاَوْضَعُوْا কিন্তু পড়িতে হইবে, لَ اَوْضَعُوْا অর্থাৎ, লামের বাদের আলেফ পড়িতে হইবে না।

৮। **মকাম ঃ** وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ (১২শ) পারার ৬ষ্ঠ রুকূর ৮ম আয়াতে ثَمُوْدَا-এর মধ্যে د-এর পর একটি আলেফ লিখিয়াছে, ঐ আলেফ পড়িতে হইবে না, ثَمُوْدَ পড়িতে হইবে। এইরূপে এই লফ্‌যটি সূরা-অন্‌নাজমের والنجم ৩নং রুকূর ১৯ আয়াতের মধ্যেও এইরূপ লিখিয়াছে, সেখানেও ثَمُوْدَ ই পড়িতে হইবে। আলেফ পড়িতে হইবে না।

৯। **মকাম ঃ** وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ (১৩শ) পারার ১০ম রুকূর ৪র্থ আয়াতে لِتَتْلُوْا-এর মধ্যে و এর পর আলেফ লেখা আছে, কিন্তু এই আলেফ পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে لِتَتْلُوَ

১০। মকাম ঃ سُبْحَانَ الَّذِىْ (১৫শ) পারার ১৪শ রুকূর ২য় আয়াতে আছে لَنْ نَّدْعُوَا কিন্তু পড়িতে হইবে لَنْ نَّدْعُوَ ওয়াও و -এর পর আলেফ পড়িতে হইবে না এইরূপ এই পারার ১৬ রুকূর প্রথম আয়াতে লেখা আছে لِشَائْءٍ শীনের (ش) বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হইবে না; বরং পড়িতে হইবে لِشَىْءٍ

১১। মকাম ঃ سُبْحَانَ الَّذِىْ (১৫শ) পারার ৭ম আয়াতে লেখা আছে لٰكِنَّا নূনের বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে لٰكِنَّ

১২। মকাম ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ (১৯শ) পারার ১৭ রুকূর ৭ম আয়াতে লেখা আছে لَاَاذْبَحَنَّهٗ লামের বাদে দুই আলেফ লেখা আছে এক আলেফ পড়িতে হইবে না, বরং পড়িতে হইবে, لَاَذْبَحَنَّهٗ

১৩। মকাম ঃ وَمَالِىَ (২৩শ) পারার ৬ষ্ঠ রুকূর ৫৭ আয়াতে লেখা আছে لَااِلَى الْجَحِيْمِ কিন্তু পড়িতে হইবে, لَ اِلَى الْجَحِيْمِ লামের বাদের আলেফ পড়া যাইবে না।

১৪। মকাম ঃ حٰمٓ (২৬শ) পারার সূরা-মোহাম্মদের প্রথম রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, لِيَبْلُوَا এইরূপে এই সূরার ৪র্থ রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে, لِنَبْلُوَا কিন্তু পড়া যাইবে لِيَبْلُوَ এবং لِنَبْلُوَ দোনো জায়গায় و -এর পরের আলেফ পড়া যাইবে না।

১৫। মকাম ঃ تَبَارَكَ الَّذِىْ (২৯শ) পারার সূরা-দাহ্‌রের প্রথম রুকূর ৪র্থ আয়াত লেখা আছে, سَلَاسِلَا দ্বিতীয় লামের পরে যে আলেফ লেখা আছে উহা পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে, سَلَاسِلَ এইরূপে এই সূরার এই রুকূতেই ১৫, ১৬ আয়াতে قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَا দুই বার আসিয়াছে ও দোনো স্থানে দ্বিতীয় ر -এর পর আলেফ লেখা আছে। ইহার হুকুম এই যে, প্রায়ই লোকে প্রথম قَوَارِيْرَ -এর উপর অক্‌ফ করিয়া থাকে, দ্বিতীয় قَوَارِيْرَا -এর উপর অক্‌ফ করে না, যদি এইরূপ করে, তবে প্রথম জায়গায় আলেফ পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় জায়গায় قَوَارِيْرَا ই পড়িতে হইবে। আর যদি প্রথম قَوَارِيْرَا -এর উপর অক্‌ফ না করে, তবে প্রথম জায়গায়ও আলেফ পড়া যাইবে না, দ্বিতীয় জায়গায় ত যাইবেই না, চাই অক্‌ফ করুক বা না করুক।

১৬। মকাম ঃ وَاعْلَمُوْٓا (১০ম) পারার মধ্যে সূরা-তওবা আছে। সূরা শুরু হয় بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ হইতে। এই সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ লেখা নাই। ইহার হুকুম এই যে, যদি উপর হইতে পড়িয়া আসিতে থাকে, তবে بِسْمِ اللهِ পড়িবে না, আর যদি এই সূরা হইতে তেলাওয়াত শুরু করে, তবে আউযুবিল্লাহ্, বিছমিল্লাহ্ পড়িতে হইবে। আর যদি উপরের 'সূরা পড়িয়া বন্ধ করিয়া থাকে এবং অনেকক্ষণ পর আবার সূরায়ে তওবা হইতে পড়া শুরু করে, তবুও আউযু বিল্লাহ্ বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করিবে, অন্যান্য জায়গায়ও এইরূপ করিতে হয়।

॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ॥